Cadence

ANNUAL MAGAZINE

2020

Bangladesh University of Professionals (BUP)

Cadence ANNUAL MAGAZINE 2020

Cadence

বিইউপি বার্ষিক ম্যাগাজিন - ২০২০

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি)
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

বিইউপি বার্ষিক প্রকাশনা	:	তৃতীয়
প্রকাশক	:	বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
সার্বিক তত্ত্বাবধান ও পৃষ্ঠপোষকতা	:	মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান, এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি
প্রকাশনায়	:	পাবলিক রিলেশন, ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, বিইউপি। ফোন: +৮৮-০২-৮০০০৩৬৮, ফ্যাক্স: +৮৮-০২-৮০০০৪৪৩ E-mail: info@bup.edu.bd, Website: www.bup.edu.bd
আলোকচিত্র	:	অডিও-ভিডিওম্যান মোঃ বাপ্পি মিয়া
গ্রাফিক্স ও অঙ্গসজ্জা	:	এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস
মুদ্রণ	:	এসোসিয়েটস্ প্রিন্টিং প্রেস ১৬৪ ডিআইটি রোড, ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০ ফোন: ০০-৪৮৩১৩৭৩৮৪, ০১৯৩৭-৬৯১১৪৪ ই-মেইল: md_jewell@yahoo.com

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান, এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি

উপদেষ্টা

প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি

প্রধান সমন্বয়কারী

এয়ার কমডোর মোঃ আমিনুল ইসলাম, এনডিইউ, এএফডব্লিউসি, পিএসসি, জিডি(পি)

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক
গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ রবিউল ইসলাম জুবেরী, অ্যাডমিন

লে: কর্নেল সিরাজ উদ্দিন আহমেদ (অব:) পিএসসি

কমান্ডার আবুল খায়ের মোহাম্মদ জাকারিয়া (ট্যাজ) পিএসসি, বিএন

সহযোগী অধ্যাপক ড. ফাহমিদা হক

সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ নাসির উদ্দিন

অতিরিক্ত পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ শওকত ওসমান

অতিরিক্ত পরিচালক মোঃ জাহাঙ্গীর কবীর

সেকশন অফিসার মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ

সেকশন অফিসার ইশতিয়াক আহমেদ

সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা মোঃ ওসমান গণি

বাণী

উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

মুজিব শতবর্ষের এ মাহেন্দ্রক্ষণে বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে বিইউপি যে কোন প্রতিকূল পরিবেশে সম্মুখপানে এগিয়ে যেতে বদ্ধপরিকর। করোনা মহামারীর এ বিশেষ পরিস্থিতিতে সহশিক্ষা কার্যক্রমের বিচরণক্ষেত্র বিইউপি ম্যাগাজিনে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের আশাব্যাঞ্জক সাড়াকে আমি সাধুবাদ জানাই। বিইউপি মানবতার কল্যাণে দক্ষ জনসম্পদ ও আলোকিত নাগরিক তৈরিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।

সবার জন্য মঙ্গলময় ও নিরাপদ বছর কামনা করছি।

মেজর জেনারেল মোঃ মোশফেকুর রহমান, এসজিপি, এসইউপি, এনডিসি, পিএসসি

বাণী

উপ-উপাচার্য
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

কোন জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার ঘটে উচ্চ শিক্ষার হাত ধরে। উচ্চ শিক্ষা নতুন নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে জাতিকে জ্ঞানের আলোয় উদ্ভাসিত করে। আর এ কাজে বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্ (বিইউপি) থেকে প্রকাশিত 'Cadence' এর মতো ম্যাগাজিন শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতা বাড়াতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের মেধার বিকাশ ও সৃজনশীলতা চর্চার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে এই ম্যাগাজিনটির নিয়মিত প্রকাশ করার উদ্যোগকে আমি সাধুবাদ জানাই।

'Cadence' এর পৃষ্ঠপোষক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে বিইউপি উচ্চ-শিক্ষার প্রসার ও মানব সম্পদ উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বর্তমানে জাতীয় ও আন্তার্জাতিক অঙ্গনে এই প্রতিষ্ঠানের সফলতা দৃশ্যমান। সারা বিশ্ব যখন কোভিড ১৯ মহামারির ধাক্কায় বিপর্যস্ত তখন বিইউপি আধুনিক ও যুগোপযোগী বিভিন্ন মাধ্যম ব্যবহার করে সেই ২২ মার্চ ২০২০ হতেই নিরবিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদান কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে। দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সর্ব প্রথম বিইউপির এই প্রচেষ্টা সংশ্লিষ্ট সকল মহলে প্রশংসিত হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের সকলের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মানসম্মত শিক্ষা প্রদান, গবেষণা ও জ্ঞান চর্চার মাধ্যমে এ বিশ্ববিদ্যালয় দেশে ও বিদেশে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে।

মানষিক ও বুদ্ধি-বৃত্তিক উৎকর্ষ সাধনের জন্য শিক্ষার্থীদের সহশিক্ষা কার্যক্রম শিক্ষার একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। আর এ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে ম্যাগাজিনটি এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে সৃজনশীলতা প্রকাশের মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে বলে আমি মনে করি। মননশীল ও আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে ম্যাগাজিনের লেখনিসমূহ শিক্ষার্থীদের বিভিন্নভাবে সহায়ক হবে। জ্ঞানের নিত্য-নতুন আলোকে উদ্ভাসিত হওয়ার লক্ষ্যে আমরা সকলে সৃজনশীল কর্মযজ্ঞে সক্রিয় হই এই আমার প্রত্যাশা।

এ প্রকাশনার সাথে জড়িত সকলের প্রতি রইলো আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। আমি এ ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সফলতা কামনা করছি।

প্রফেসর এম আবুল কাশেম মজুমদার, পিএইচডি

সম্পাদকীয়

প্রধান সম্পাদক
বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব প্রফেশনালস্
মিরপুর সেনানিবাস, ঢাকা।

আলোকিত মানুষ তৈরি করার জন্য পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও দরকার সহপাঠ্য কার্যক্রম যা প্রতিভাকে আরও বিকশিত করে। তারই অংশ হিসেবে তৃতীয়বারের মত বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করার বিষয়টি অত্যন্ত আনন্দের ও গৌরবের। উক্ত ম্যাগাজিনে অভিজ্ঞ শিক্ষক, কর্মকর্তা ও শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গল্প, কবিতা, ছড়া, রম্যরচনা, ভ্রমণকাহিনী, বিজ্ঞান ও শিক্ষামূলক রচনা, মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক বিভিন্ন রচনাসমূহ স্থান পেয়েছে, যা আধুনিক চিন্তামনস্ক নাগরিক তৈরিতে অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

বর্তমানে করোনার মত মহামারিতেও বিইউপি স্বীয় কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছে যা সত্যিই অনন্য। বার্ষিক এই প্রকাশনা মুজিব শতবর্ষের উদযাপনকে স্বরণীয় রাখতে ভূমিকা রাখবে। আমি আশা করি বিইউপি ম্যাগাজিন নতুন প্রতিভার জন্ম দিবে, যাঁরা ভবিষ্যতে দেশ গঠনে নিজেদের সৃজনশীল পরিচয় রাখবে।

পরিশেষে, এ ম্যাগাজিনের সাথে জড়িত সকল সদস্যের প্রতি রইলো আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও অভিনন্দন। আমি এ ম্যাগাজিনের সর্বাঙ্গীন সফলতা একান্তভাবে কামনা করছি।

গ্রুপ ক্যাপ্টেন মোঃ রবিউল ইসলাম জুবেরী, অ্যাডমিন

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২০

ক্র/ন	বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
০১	Eventful 2020: Transforming Challenges to New Trend	Lieutenant General Ataul Hakim Sarwar Hasan, SBP, SGP, ndc, afwc, psc, PhD	০১
০২	স্বাধীনতার ডাক	ব্রিগে. জেনা. মোঃ মেফতাউল করিম, বিএসপি, এসপিপি, বিপিএম, এনডিসি, পিএসসি (পিআরএল)	০৪
০৩	Bangabandhu's Thought of Peoples' Policing: A Brief Note	Professor M Abul Kashem Mozumder, PhD & Shaikh Yusuf Harun	০৫
০৪	Bangladesh University of Professionals: Excellence Through Knowledge	Prof Maj Gen Mohammad Quamruzzaman (Retd)	০৮
০৫	কবিতার অপেক্ষা	ফাহমিদা আহমেদ	১১
০৬	স্মৃতিগুলো অমলিন	মোঃ মুঈন রিদওয়ান চিশতী	১৩
০৭	Thoughts	Mirana Tahsin	১৬
০৮	খুশির ফেরিওয়ালা	সাবাহ মাহজাবিন সারোয়ার	১৭
০৯	Silent Cry	Sheikh Sourov	২০
১০	নতুন জীবন, অচেনা পৃথিবী, একটি দুঃস্বপ্ন ও আমি	জাওহারা রহমান জর্জিয়া	২১
১১	দি গার্ডেনে একদিন	Fateen Ishraq	২৪
১২	It's You	Sumaiya Mehreen Meem	২৭
১৩	Waiting	Shazeed-Ul-Karim	২৮
১৪	Couple of Good Lessons	Lt Col Alamgir Kabir, psc, EB	২৯
১৫	কমতি	নুসরাত জাহান	৩১
১৬	বিদেশে উচ্চশিক্ষা: স্বপ্ন যখন সত্যি হয়	ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান	৩৪
১৭	বিদায়	মোঃ আরিফ হোসেন	৩৬
১৮	The Melancholic Mother-Earth!	Mahbub Alam	৩৭
১৯	সময়ের পথে	সাইমা আফসারা	৩৮
২০	আবদ্ধ জীবন	মোঃ আবু বকর	৩৯
২১	Confined	Sumaiya Tarannum Sujana	৪১
২২	দেশ মাতৃকা	আব্দুল্লাহ আর রাকিব	৪২
২৩	Stranger	Shadman Araf	৪৩
২৪	অন্তরণ	মালিহা ইসলাম মনামি	৪৫
২৫	টিটু	মোসাঃ সানজিদা ইসলাম পৃথিবী	৪৬
২৬	মহামারী শেষ হবে	শাহরুখ খান আকাশ	৪৯
২৭	লজেন্স	আফসারা তাসনীম শাম্মী	৫০
২৮	অব্যক্ত কথা	তাহমিনা সুলতানা	৫৩
২৯	Gambler's Fallacy	G.M. Naimuz Saadat	৫৪
৩০	Life	Shourovi Akter	৫৬

সূচিপত্র
বিইউপি ম্যাগাজিন-২০২০

৩১	গল্পের নাম: যোগসূত্র	Kazi Siam	৫৭
৩২	অতলে এক স্বগত ডুব, খুঁজে পাওয়া প্রিয় গভীর আত্মীয়	Md. Imran Hossain	৫৯
৩৩	ডিএনএ আঙ্গুলের ছাপ (DNA Fingerprinting)	তোফায়েল আহমেদ	৬০
৩৪	ভ্রমণ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ	মেজর শাহরিয়ার রহমান আবির, এএসসি	৬৩
৩৫	লন্ডনে পড়তে যেয়ে আমার তিনটি বিপত্তি	শাশীশ শামী কামাল	৬৬
৩৬	Unrequited Love	Raufur Rahman	৬৮
৩৭	World of High Expectation	Md Shariful Hasan Khan	৬৯
৩৮	Life	Md. Rakib Hasan Rabbi	৭১
৩৯	দারিদ্র্যের সমাজবিজ্ঞান	মোঃ তানভীর মাহতাব	৭৩
৪০	Pseudo-Activism: The Global Trend	Iftesham Iftekhar	৭৬
৪১	নাফিসা	মেজর মোঃ এরশাদ মনসুর, ইবি	৭৯
৪২	Lockdown	Shabab Junayed	৮৩
৪৩	Why So Judgemental?	Simeron Islam Nirjana	৮৪
৪৪	যান্ত্রিক জীবন ও আমরা	আনিকা মেহের আমিন	৮৫
৪৫	জাপানের স্বাস্থ্যসেবা আধুনিক বিশ্বে অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত	মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ	৮৭
৪৬	অমানুষ	আলী মর্তুজা	৯০
৪৭	Stained Hearts	Tasnim Rahman	৯১
৪৮	ওয়াদা	জান্নাতুল ফেরদৌস	৯৩
৪৯	A Rainy Morning Incident	Tasnim Naz	৯৬
৫০	মায়ের চাদর	এস এম নাহিদ সরওয়ার সুমন	৯৮
৫১	Carnival of Rust	Azharul Islam	১০০
৫২	ফাইনম্যান টেকনিক এর আদ্যোপান্ত	মো. তানজিল হোসেন	১০২
৫৩	Havoc wrecker	Arshia Habib Susmi	১০৪
৫৪	সুখ	আব্দুল্লাহ আল মারুফ	১০৫
৫৫	ইলন মাস্ক: স্বপ্ন যখন বিশ্বজয়	ফারদিন ইসলাম	১০৭
৫৬	পরিচয়	জেবা মুবাশ্বিরা	১১০
৫৭	কালো রাত	ইসমাত জাহান টুম্পা	১১৩
৫৮	অমাবশ্যার চোখে	আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)	১১৭
৫৯	Losing a Mother Forever	Srabonti Habib Proma	১১৮
৬০	স্বপ্নের প্রজাপতি	সাজিয়া রহমান	১১৯
৬১	অতীত	এহসানুল হক	১২০

Eventful 2020: Transforming Challenges to New Trend

Lieutenant General
Ataul Hakim Sarwar Hasan
SBP, SGP, ndc, afwc, psc, PhD
(Former VC, BUP)

At this age of fourth generation 4.0 revolution, it is essential for all the educational institutions to be dynamic and progressive in imparting knowledge for matching the need of the workplace. Incorporating new theories, implementing new practices in syllabi, and imparting lessons on the same can mold the educational services to match the need of the present world. While BUP has been striving for that objective, the sudden outbreak of the COVID-19 pandemic posed a new challenge. The challenge of COVID-19 had multidimensional issues including the closing of the classes, session loss and session jam, personal safety of students, faculties, and staff, uncertainty, and a probable delay in going back to normalcy, etc. From the very beginning, BUP along with its young, energetic, and dynamic faculties have met the COVID-19 challenge head-on through participative and progressive decision making. The cornerstone of continuing the academic programmes during the pandemic situation was to maintain quality, avoid any interruption resulting in possible session loss, and to ensure the safety of all partners in learning. At the onset, it was estimated that the pandemic situation will prevail for an uncertain period. Therefore, BUP authorities deemed that academic programmes must be continued to ensure zero loss of valuable time from the academic life of the students. Through an immediate Dean's Committee meeting it was decided on 15 March 2020 to switch to online conduct of the delivery of lessons from 22 March 2020 onward.

The decision to conduct courses online meant ensuring the uninterrupted imparting of knowledge which entails delivery of the lesson, retention of imparted knowledge, and finally evaluation and assessment of the learning outcomes. Out of the mentioned spheres, BUP first began with the delivery of the online lessons. To do so, BUP conducted lecture sessions using existing major digital platforms like University Comprehensive Academic Management - UCAM (BUP's own digital platform), Zoom, MS Team, Goggle classroom, and Facebook Live.

Online delivery of lessons demands availability of required hardware and software facilities including access to an internet connection with sufficient speed at either end. To meet this requirement, steps were taken by the university to equip all the students with the required tools. More than 400 students with dire financial constraints were assisted by providing monetary benefits like taka 10,000 from Students' Welfare Fund. Approximately 300 students were provided

with stipends. A good number of students (more than 1000) were given financial assistance to buy mobile data. The university arranged the purchase of laptops at reduced prices for approximately 200 students which is payable in 10 installments. Out of these 10 installments, three were paid by BUP. Students with extreme financial distress were given free laptops. Laptops were also arranged for the faculty members. Faculties were also provided with mobile data for taking online classes. Periodical interactive sessions were arranged with all the faculties and student representatives to identify the strengths and weaknesses of the courses conducted online. BUP completed the lessons of the first (January-June) semester without any session loss and conducted the second (July-December) semester by building on the lessons learned from the first semester and maintaining the integrity of the academic calendar.

The most notable indication of online conduct is the attendance of students which is much higher than the physical classroom-mode. As mentioned before, one of the important aspects of knowledge delivery is the assessment or conduct of exams in online mode. To ensure judicious assessment, BUP has already acquired the world-class Learning Management Software - Moodle, with all necessary features like a virtual proctorial system to conduct online exams. The higher studies for the researchers attending Ph.D. programmes are also being continued online. It is perceived that the ongoing pandemic situation will continue for quite some time. 'Online' mode will be the new normal for the coming days. To keep the students and faculties accustomed to the online mode, BUP has already planned to conduct different programmes for the professionals from the forthcoming academic year in hybrid mode. This mode will use both online and physical classes to deliver knowledge.

Apart from trying to maintain regularity in academic activities through online classes, BUP has also been trying to instill values of different human dimensions among the students through a variety of club activities. BUP emphasizes that being humane is one of the essential features of being a responsible member of the society. And this great virtue can be polished through a gamut of activities offered by different clubs in BUP. Within the pandemic situation, BUP maintained all club activities. 'MUJIB SHOTO BORSHO', commemorating 'JATIYA SHOK DIBASH', Lit Fest, Cultural Fest, and many webinars were arranged online with remarkable participation from home and abroad. BUP has already obtained the innovation patent of '***Contactless Automatic Self Energized Drive Shaft***', a great feat by the faculties and students. '***Team Trojan'*** from BUPRC (Club of Faculty of Science & Technology) became Runner Up in the 'NASA Space Apps Challenge 2020'. Many other clubs have also continued their regular activities with varying degrees of success.

While maintaining its usual activities, BUP has also been working relentlessly towards its future development. Securing a position in the world university ranking is currently one of the most important objectives of BUP. Steps are underway to formalize the '10 Years Academic Strategic

Plan'. This plan will define the strategies so that BUP may obtain a reputable position in the world university ranking. To establish BUP as the nucleus of research activities in the region, steps have been taken to expand the domain of research for in-house and affiliated institutions. BUP has planned to publish multiple peer-reviewed, impact factor journals and has started working on the establishment of the BUP press.

Besides the remarkable drive of the students and faculties, BUP has also continued all the administrative functions to ensure an unhindered academic environment. BUP has held the Senate meeting and several Syndicate, Dean's Committee, and Financial Committee meetings regularly. New projects entailing the expansion of the BUP campus and the construction of a multistoried academic building for the Business Faculty are in the process of completion. It is estimated that the new infrastructural improvements will be accessible to the BUPIANS from the next academic year.

The effect of the COVID-19 pandemic is ironically a unique experience shared by the whole world. Within the uncertainty thrust upon us by the COVID-19 situation, BUPIANS have continued their journey in a progressive and adaptable manner. The travel entailed many challenges – fear, uncertainty, and the pain of losing dear ones. Adapting to anything new is always a challenge, but someone must become the pioneer in this journey. Being the first to shift to the online mode was a decision that demanded great courage, determination, and foresight. The travel was possible due to the exemplary dynamism and wisdom of the leadership, the spontaneity and flexibility of the faculties, and above all, the great determination and enthusiasm of the students. When society, in general, had become more isolated and fragmented due to the onslaught of COVID-19, BUP emerged in its most unified form. Our travel has set a new trend, beckoning many to the silver linings behind the darkness. With this feat, the laurels adorning BUP will certainly demand even more accomplishments in the future. All the faculty members are now more enlightened and enthusiastic to persist with the academic curriculum under any circumstance. Through the challenges of COVID-19, BUP has set a new trend – a much needed uninterrupted endeavor to steer the ship towards the designated academic mission of ensuring "Excellence through Knowledge."

স্বাধীনতার ডাক

ব্রিগেডিয়ার জেনারেল মোঃ মেফতাউল করিম
বিএসপি, এসপিপি, বিপিএম, এনডিসি, পিএসসি (পিআরএল)
সাবেক রেজিস্ট্রার, বিইউপি

একটি অঙ্গুলি
একটি নির্দেশনা।
একটি কণ্ঠস্বর
একটি আহ্বান।
একটু অঙ্গুলী হেলনে,
প্রাণের সঞ্চার ঘটেছিল একাত্তরে।

প্রান থেকে প্রাণান্তর,
মন থেকে মনান্তর,
লোক থেকে লোকান্তরে,
সম্মীলন ঘটেছিল সকল শ্রেণীর।

ঐক্যের জোয়ারে ভেসেছিল দেশ,
ঘটেছিল সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ।
সংগ্রামের চেতনা থেকে মুক্তির বাসনা,
সংগ্রামের চেতনা থেকেই স্বাধীনতার প্রেরণা।

Bangabandhu's Thought of Peoples' Policing: A Brief Note

Professor M Abul Kashem Mozumder, PhD
Pro-Vice Chancellor, BUP and

Shaikh Yusuf Harun
Secretary, Ministry of Public Administration, GoB

After achieving the long-cherished independence in 1971, war torn Bangladesh found itself into ruins. Besides loss of thirty million people of the country, most of its infrastructures including roads, bridges, culverts, industries, inland ports, and seaports were destroyed. The exchequer of the government was found totally empty. Sovereign Bangladesh had no military or civil aircraft. The major challenge of the newly independent nation were ensuring rehabilitation of ten million refugees, reconstruction of thousands of damaged houses in the villages and urban areas, providing food, cloth, medicine and shelter to its more than seventy-five million people, and restoring desired law and order situation. In the process of state-building and in delivering the services provided by the state, the father of the nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman dreamt, among many others, of a democratic police force that could stand before the people to accelerate the gargantuan reconstruction process as well as maintaining law and order situation in the country. He had strong belief in the commitment of our police force towards Bangladesh. Accordingly, a strong foundation of democratic policing was laid by Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman.

The most remarkable episode of the antiquity of Bangladesh Police began when on 25th March 1971 the Bengali police officials and their sub-ordinates jawans fought back and subsequently participated in the nine-month long Liberation War in line with the clarion call of the father of the nation. During the War a large number of police from all ranks and files gave their lives for the cause of liberation. The resistance by the Bengali members of police at Rajarbag is essentially the first phase of armed skirmish during the Liberation War.[1] With this legendary role in the Liberation War, Bangladesh Police Force started its journey soon after the country achieved its independence on 16 December of 1971. On 10 January 1972, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the architect of independence and the father of the nation returned to independent Bangladesh and took the leadership of the government. The holistic reconstruction of the war torn country, administrative reformation, rehabilitation of ten million refugees staying in India, drafting of the constitution, formulating the first five year plan along with strengthening the Planning Commission by appointing well-reputed professionals from universities, sending back quite promptly the Mitrabahini (allied troops) to India, earning recognitions of various countries, holding of fresh elections and the like

were some of the remarkable achievements during his rule. Bangladesh police was a significant state instrument employed by the father of the nation to overcome the immediate crisis and reconstruct the war-ravaged[2] Bangladesh. Bangabandhu envisioned a proactive police force both in state and nation building.

Bangladesh Police is a disciplined force as per Article 152 of the Constitution[3]. It is a structured organization having its network all over the country. Bangladesh Police Force owes its creation to the Police Act, 1861 and several other legislations that regulate the day-to-day activities of the members of police force[4].

If we take a look in the official website of the Police Department, we will get to know that immediately after Bangladesh's independence on 16 December 1971, the then police force had been remodelled and reshaped as Bangladesh Police and assumed the role of a national law enforcing force. Bangladesh Police is primarily responsible for the preservation of peace and order, protection of life and property of the people and prevention and detection of crime within the periphery of the state. The traditional role of police in Bangladesh has undergone significant changes after the liberation. The role of police now is no longer confined to maintenance of law and order and prevention and detection of crime. Apart from the mandatory works that needs to be done, there are manifold problems that need taking care of. To meet the needs of an independent country, the police is now required to play its role in the development process by providing the basic security required for sustained economic growth of the country. Police also is contributing substantially to this field by keeping under control the economic and techno-crimes which retard the process of the development. Additionally, it plays a vital role in disaster management, environment, ecotourism, bio-diversity conservation and so on, which have got enormous impact on state economy and development. Bangladesh police, the single most institution entrusted with the responsibility of ensuring rule of law and human rights, is at a cross-road to promote itself to a height to adopt the role of service rather than force, devoted to providing reassurance of service delivery, flexibility to community wishes, cares and social justice.

Bangabandhu dreamt that the police force as the prime law enforcing agency of the country will strive to track citizen's engagement in policing, better value and better management. Based on his vision, the police force now envisages a new structure erected on the bedrock of information and communication technology, skill adequacy, knowledge-based initiatives and community partnership that will be styled on a schema of cascading change to set a stage for a clear interface between police and citizenry. It tends to explore innovative practices in addressing the challenges of the time and reorienting its mission and vision and augment its capacity towards citizen centric service, to uphold professionalism, image and visibility of the service and the value and virtue of the service to the community. All such mass oriented multifarious activism of the police indeed emanated from the far-sighted visions of Bangabandhu to construct his Sonar Bangla. In his own words, which he delivered on the observance of the first Police Week of Bangladesh Police on January 15, 1975 at Rajarbagh:

One thing you must not forget is that you are the police force of an independent country. You are not the police force of a foreign occupying exploiter; you belong to the people. You are responsible to provide services to the people, love the people and help the people at their bad times. Yours is the forces which has jurisdictional authority and influence across the furthest corners of the country, including rural villages. Now the people of Bangladesh want the only favor from you that is security and safety, so that they can sleep in peace. They expect protection from you in a way that thieves, robbers, miscreants and the corrupted people cannot cause harm to them. . . . Today, you also need to take the vow- We will form such a police force, who won't rule but serve the people (Translated by the author).

It is therefore imperative to think seriously and act sincerely on Bangabandhu's thoughts and views about police force and the subsequent measures in line with the aiming to make it as an instrument to achieve the goals of democratic or pro- peoples' policing in the country. However, after 49 years of independence, we are about to witness the realization of at least the partial, if not full, the implementation of the vision of the Father of the Nation as is evident from the writings of a Police Official in social media. Highlighting the legendary role of Bangladesh Police in our Great Liberation War, he proudly stated that:

It is said the London Police is the most efficient and people friendly in the world. It is widely acclaimed that due to their sincerity and commitment to serve the people the children also call for help from London Police when they cannot find their books. It will perhaps not an exaggeration to say that in the present pandemic situation the police force in Bangladesh especially in metropolitan areas can be compared with their counterparts in London. Distresses and sufferings of human beings including casualties from Corona are increasing at an alarming rate in countries around the world. Bangladesh is no exception. At the earlier stage of the pandemic in Bangladesh, it is reported both in electronic and print medias that people are leaving behind their Corona affected mothers in the jungles, and there are also numerous instances that no one including near and dear ones are attending in the last rite of the dead. In such tragic situations the members of the police force sometimes in collaboration with some local volunteers or sometimes on their own initiatives are coming forward to extend their services without thinking the risks of their lives.

Echoing with the above, we may supplement that the police forces like other front line service providers cannot avoid official calls, even if they do not have safety gear in line with strict police rules and regulations. Also, it is nearly impossible for the police to practice social distancing while carrying out their duties as people are not yet aware enough to observe the necessary distance and roam local markets and police have been mainly infected with COVID-19 from such situations. It is true that they cannot ensure 100 percent safety and security of the citizenry, but they are trying their best in discharging their duties. This is perhaps one of the notable examples of Bangabandhu's people friendly policing in Bangladesh. It is therefore the high time for the relevant authorities to dig deep to identify these challenges and work dedicatedly to overcome all the constrains that usually emerge from them.

[1.] *Source: Police in Liberation War: https://www.police.gov.bd/en/supreme_sacrifice_in_1971*
[2.] *Source: History: https://www.police.gov.bd/en/history*
[3.] *Source: Police System of Bangladesh by Shahriar Islam: https://www.academia.edu/4063832/Police_System_of_Bangladesh*
[4.] *Source: History: https://www.police.gov.bd/en/history*

Bangladesh University of Professionals: Excellence through Knowledge

Prof Maj Gen Mohammad Quamruzzaman (Retd)
Adjunct Professor, Faculty of Business Studies

Introduction

University education in Bangladesh got its new dimension with the involvement of patriotic Armed Forces. The creation of Bangladesh University of Professionals (BUP) on 05 June 2008 as the 29th out of total 46 public universities infused light and brought a significant quantitative and qualitative change in our Country. Latin '*universitas magistrorum et scholarium'* denotes a university as the community of teachers and scholars irrespective of one's background: military or civilian, doctor or engineer, businessman or artist, humanitarian or philanthropist.

War studies or polemology, a multi-disciplinary academic field dominated the arena of higher education since human existence. Greek poet Homer's Iliad and Odyssey, Maharishi Valmiki's Ramayana, sage Vyasa's Mahabharata, and such other epics depict war studies which are the primary sources of various -logy, -ism, -ics, -gogy, -sophy, -cracy in university education. Peace is enforced and stability is ensured for mankind through wars against enemies and evils in various forms and types, e.g., war against coronavirus.

Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Maritime University, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Aviation and Aerospace University followed BUP's flagship as military's 2 more public universities. Bangladesh Army University of Science and Technology at Saidpur, Bangladesh Army University of Engineering and Technology at Qadirabad, Bangladesh Army International University of Science and Technology at Comilla are the military's 3 private universities out of total 105 private universities inspired by BUP's Excellence through Knowledge.

BUP for Professionals by Professionals

The BUP Act 2009 passed by our parliament is said to be effective from 05 June 2008. The ideation of this university had begun in 2000 when MBA programme was being planned at Military Institute of Science and Technology (MIST) besides its engineering courses. MIST had been looking for affiliation options with National University and/or University of Dhaka for its courses including MBA programme. Now MIST itself is an affiliated institute of BUP along with many other institutes of Armed Forces in Bangladesh.

BUP Act 2009 possesses 70 sections in total with relevant definitions in Section 2. 'Professionals'

is defined in Sub-Section 2(!9) as a person or a student willing to study and who is either serving now or will be serving in future at any sector like engineering, security, polemology or war studies, medical science, management, business studies, etc. Above legal definition of professionals and Section 4's affiliations give the rationale to BUP practicing universality and striving for Excellence through Knowledge in diversified fields.

Knowledge and Epistemology at BUP

Knowledge can be implicit or explicit which is own memories, senses, mental states, beliefs, perceptions, and thinking processes. Knowledge about knowledge - its philosophy is epistemology. Greek '*phil*' is love, '*sophia*' is wisdom or knowledge: M Phil means someone became a master for love of knowledge, PhD means a doctor for love of knowledge in a particular field or discipline. Army, Navy, and Air Force all 3 Forces HQs provide the high priority to post knowledgeable officers in faculty and administrative positions in BUP.

The VC, a two starred General, a PhD and a Professor is very visionary and dynamic in providing strategic directives and managing curricular, co-curricular and extra-curricular affairs with all his credentials and concerns. No time and scope was lost in corona lockdowns as the able VC and his bright team of faculty members and support staffs remained alert and active 24/7 to continue online classes and essential activities. They carried out needs assessment and went for capacity building through training the faculties and distributing e-gadgets to students.

Civilianization and Militarization at BUP

BUP has become a unique university where synergies and process plus equations take place by meaningful interactions among civilians and military persons both serving and retired. Here learning on optimization in academic management is very encouraging through civilianizing military, and militarizing civilian as and when required. Self-knowledge needs to be weighed and sharpened against others' as Plato asked for justification of knowledge in his *Theaetetus*. Justification on Socrates, a military officer is made by Athens' High Court honourably acquitting him after 2400 years.

Paradox and fallacy may prevail as to decide who is more knowledgeable, who to lead whom. '*Universitas magistrorum et scholarium*' the community of teachers and scholars prescribes meritocracy and proscribes other -cracy like autocracy, bureaucracy, stratocracy, etc. Australian Monash University is named after a meritorious military officer John Monash who was a VC of Melbourne University (1923-1931). Out of 44 USA Presidents, 31 of them possessed military background. Winston Churchill, a Prime Minister of UK was a military officer who won Nobel as an academician.

Research and Heutagogy at BUP

Research entails systematic and creative work to increase the stock of knowledge. Research comes from French '*recherche,*', to go about seeking for a solution to a problem. Faculty members in BUP carry out individual research to improve pedagogy, andragogy and heutagogy for effective teaching and learning. Greek *peda* is child, *andra* is adult, *heuta* is self-discovery and *gogy* is teaching. The participative academic environment and heuristics at BUP ensure disciplining researchers' thought process, self-discovery and publish reports and articles in BUP Newsletter, Cadence, Journal, Inquest etc.

Conclusion

The role of BUP in higher education is significant which pioneered 2 other public and 3 private universities out of total 46 public and 105 private universities. Epics by Valmiki, Vyasa, Homer, and other polymaths are the sources of all higher education subjects. Epistemology identifies polemology to be the root of all knowledge; wars at Lanka, Kurukshetra, Troy, etc. Love for knowledge helped Homo sapiens challenging and wining against enemies, diseases, calamities to survive and sustain.

Civilian-Military synergies at BUP ensure Excellence through Knowledge due to historiographical legacies, organizational strengths and disciplined systems. Dynamic VC and his team with visionary leadership paved the way for all nurturing meritocracy and excelling in corona pandemic. No paradox or fallacy of superiority by anyone in higher education. We adopt research and heuristics, optimize knowledge through civilianization and militarization as and when required.

কবিতার অপেক্ষা

ফাহমিদা আহমেদ
ডিপার্টমেন্ট অব ইন্টারন্যাশনাল রিলেশনস্
ব্যাচ-২০১৭

আমার মেয়ে আবৃত্তি। খুব শখ করে একটা ময়না পাখি উপহার নিয়েছে। তাঁর বাবার কাছ থেকে। যদিও আবৃত্তির বাবা পশু-পাখি পোষার ঘোর বিরোধী। তবুও একমাত্র মেয়ের শখ বলে কথা। মেয়ের আব্দারে রাজি হয়ে গিয়েছে। আবৃত্তি ময়নাপাখি পেয়ে আনন্দে আত্মহারা। আদরে আব্দারে কিভাবে যেন পাখিটার নাম রেখে দিল কবিতা। বাহির থেকে কেউ ঘরে এলেই পাখিটা, কবিতা কবিতা বলে তোয়াজ করতো। আর কবিতা নিজের নাম বলতে শিখেছে বলে মেয়েটা আমার আনন্দে উৎফুল্ল। বারবার তাঁর বাবাকে গিয়ে বলতো। বাবা জানো আমার ময়না পাখিটা কবিতা কথা বলা শিখেছে। এভাবে আবৃত্তি কবিতাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকতো কথা শেখাতে। মাঝে মাঝে পাখিটার চক চকে কালো পালক ও হলুদ ঝুটি দেখে হঠাৎ বলেছি, কিরে কবিতা?? আমার ডাকে পাখিটা সহসা চমকে গিয়ে থমকে থমকে বলতো ভালোবাসি, ভালোবাসি।

আমার কলেজ পড়ুয়া মেয়েটি সম্ভবত কবিতাকে এসব বুলি শিখিয়েছে। এ দেশের কলেজ পড়ুয়া মেয়েরা এর বেশি কিইবা জানে? ফলে পাখিটার নিত্য ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ ভালোবাসি শব্দটা। হঠাৎ এক রাতে আবৃত্তির বাবা খুব অসুস্থ হয়ে পড়লো। হাসপাতালে নেওয়ার পর ডাক্তার বললেন, তিনি আর নেই। আমার পুরো পৃথিবী নিস্তব্ধ হয়ে গেল। মানুষটাকে এভাবে হারিয়ে ফেলব। খুব বেশি ভালোবাসতাম। নিবিড় নিভৃতে সাদাশাড়িতে আটকে গেল জীবন গল্প।

সহসা একদিন আমার মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। ভালোবাসারই বিয়ে। যাওয়ার সময় আমার পায়ে হাত রেখে কাঁদল। মা কবিতাকে খেতে দিও। কবিতা তোমার কাছেই থাকল।

আমি মুখ ফুটে আর বলতে পারলাম না, কবিতাকে সাথে করেই নিয়ে যা। কবিতার দানাপানি জুগিয়ে ওর কথা শুনবো। এতে অতীতের স্মৃতি বেশি মনে পড়বে। তোর বাবা থাকলে না হয় কবিতার যত্ন নিতে পারতো। আমি একা মানুষ।

কিন্তু সুখের আশায় রোরুদ্যমান আমার কন্যা বেনারসির রঙিন বাহারের কাছে, আর সব মায়ের মতই আমিও নির্বাক থেকে মেয়েকে গাড়িতে তুলে দিলাম।

কিছুদিন পরই শ্বশুরবাড়ি থেকে আবৃত্তি ফোন করে বলল। মা কবিতাকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিও। সেকি এখনও ভালোবাসি বলে ডাকে? এখানে এসে বুঝেছি তোমার মত ব্যস্ত মানুষের পক্ষে কবিতার আহার জোগানো কতটা

মুশকিল। মা পাখিটা না খেতে পেয়ে মরার আগেই ছেড়ে দিও। দোহাই তোমার।

বুঝলাম বিয়ের পানি মেয়েটাকে বড্ড বেশি সংসারী করে তুলেছে। কিন্তু কবিতাকে বিদায় দিতে গিয়ে আমি অবাক। খাঁচা খুলে পাখিটাকে যতই উড়ে যেতে বলি, ততই সে খাঁচার ভেতর ওড়া উড়ি করে। আর বলতে থাকে ভালোবাসি, ভালোবাসি। খাঁচা খোলা রেখেই চলে গেলাম। কিন্তু কবিতা পালায় না। ঐ এক কথা ভালোবাসি, ভালোবাসি।

হঠাৎ ভালোবাসি শব্দটা শুনে আবৃত্তির বাবার কথা মনে পড়ে গেল।

: আবৃত্তির বাবা বলতো, আচ্ছা ভালোবাসা মানে কি?

: আমি বলতাম, ভালোবাসা মানে অপেক্ষা।

: সে বলতো অপেক্ষা মানে কি?

: আমি বলতাম, অপেক্ষা মানে তুমি।

ঠিক এসব ভাবতে ভাবতেই কবিতা আবারও ভালোবাসি, ভালোবাসি, ভালোবাসি বলে ডাকল। আমি এখন এই খাঁচাটির দাসী। কবিতাকে নিয়ে এখন মৃত্যুর অপেক্ষা করি.....।

স্মৃতিগুলো অমলিন

মোঃ মুঈন রিদওয়ান চিশতী
ডিপার্টমেন্ট অব বিবিএ (জেনারেল)
ব্যাচ-২০২০

খুব সকালে ঘুম থেকে উঠবার অভ্যাস আমার। সামনের বাগানটায় খানিকক্ষণ পায়চারী আর ফুলগুলোয় নিজ হাতে পানি দেওয়া; তারপর চায়ের পেয়ালা হাতে কোনার টেবিলটায় পত্রিকা নিয়ে বসা - দিব্যি কেটে যায় সকালটা। আজও এর ব্যত্যয় হলোনা। পত্রিকায় দ্বিতীয় পাতাটা শেষ করে মাত্রই পরের পাতাটা খুললাম, দারোয়ান এসে বলল, "স্যার, ফর্সা মতন একটা লোক আইছে; আফনের লগে দ্যাখা করবার চায়।" ক্লান্তিবোধ হচ্ছে, লেখালেখি করছি প্রায় আট-ন'বছর হলো। প্রতি বইমেলায়ই আমার একটা করে বই বের হয় ; এবারও হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিতে লেখা চারশ পৃষ্ঠার একটা উপন্যাস। গেল দু'সপ্তাহেই বোধহয় ছয়-সাতটা ইন্টারভিউ নেয়া হয়ে গেছে। আজও বোধ করি তেমন কেউ হবে। মুক্তিযুদ্ধ না দেখা বছর সাইত্রিশেক একজনের মুক্তিযুদ্ধেরই ওপর লেখা বিশাল এক উপন্যাস সবার কৌতুহলের উদ্রেক করবে - এটাই স্বাভাবিক। আমি দারোয়ানকে বললাম,"যাও, ওনাকে আসতে বল।"

১

"বুবু তুই না বড্ড জ্বালাস- বুঝলি?"

"লক্ষ্মী ভাই না আমার! আচ্ছা, এই নে, এবার তো যা।"

বেশ রা তুলেই বোনের বাড়িয়ে দেওয়া নোটটা নিয়ে হাটের উদ্দেশ্যে ছুটে চলল অপু। বুবুর সাথে খুব সখ্যতা ওর। হওয়ারই কথা। ওদের মা নেই। এই সংসারটায় বাবা ও ছোট ভাইকে তো এখন পর্যন্ত আগলে রেখেছে ফাহমিদাই! গত বছর ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করবার পর এখন ওর বিয়ের কথা চলছে। কিন্তু ফাহমিদার ঘোর অমত - অপু মোটামুটি বড় না হওয়া পর্যন্ত বিয়ের পিঁড়িতে বসছেনা ও। ওদের বাবা, রহমান সাহেব মুখে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করলেও মনে মনে খুশিই হয়েছেন- ওকে ছাড়া বাকি দু'জন পুরোই ছন্নছাড়া হয়ে যাবে যে।

সেই চার বছর বয়স থেকেই অনেক মমতা আর স্নেহের স্পর্শে আজ অপুকে এতটুকু করে তুলেছে ফাহমিদা। অপুও 'বুবু' বলতে অস্থির, পাড়ার ফুটবল ক্লাবের চাঁদার পয়সা, ওর ঘুড়ি-নাটাই কেনার টাকা- সবই বুবুর কাছে চায় ও, বুবুর জন্য ভালোবাসারও অন্ত নেই ওর। কিন্তু লক্ষ্মীর মতো আগলে রাখা ফাহমিদার ছোট্ট এই পরিবারটিতেও নেমে আসলো কালো মেঘের ঘনঘটা। একাত্তরের এপ্রিল মাস। নিরীহ-নিরস্ত্র বাঙালিদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে হায়েনারা। পাকিস্তানি বর্বরদের নির্মমতায় স্তব্ধ বাঙালিরা তখন উদ্ভ্রান্তের মতো দিগ্বিদিক ছোটাছুটি করছে। ফাহমিদার বাবা সিদ্ধান্ত নিলেন বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়া চলে যাবেন। তারপর একদিন সেই দিনটি এসে উপস্থিত হলো,"মাইয়্যালোকেরা উইঠ্যা পড়েন, ফজরের আগেই সোনাদীর বাজারে পৌঁছাইতে হইব।"

নৌকায় উঠার মুহূর্তে বাঁধার মুখে পড়েন ফাহমিদার বাবা। ঘাটে প্রায় হাজারখানেক লোক অপেক্ষমান। সবার চোখের দৃষ্টি শূন্য, বুকে জমা রাজ্যের হতাশা। মহিলাদের আগে আগে নৌকায় উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত। তবুও হায়েনাদের করাল গ্রাসে নিশ্চিত মৃত্যুর চেয়ে অনিশ্চয়তার মাঝে বিরাজমান আলোকবিন্দুর জন্যেও উদ্বাহু সবাই। ফাহমিদাকে এক প্রকার জোর করেই ওই নৌকায় তুলে দিলেন রহমান সাহেব। "একদম কাঁদবি না।

আর সবসময় বাবার সাথে সাথে থাকবি। ওরে বোকা, ওপারে গিয়ে তো আবার দেখা হচ্ছেই।"- বলতে বলতেই অপুকে ধরে হু হু শব্দে কেঁদে উঠল ফাহমিদা। "এই মাইয়্যা! তাড়াতাড়ি উঠো। নাও ছাইড়া দিতাছি।" ফাহমিদা নৌকায় উঠার পূর্বে অপু ওর পুটলি থেকে হাতড়ে বের করে আনে একটা রঙ ওঠা কাঠের ঘোড়া - এক নববর্ষে ফাহমিদাই ওটা দিয়েছিল ওকে।

"বুবু, এটা তোর কাছে রাখ। যখন আমার কথা মনে পড়বে এটা দেখবি।" আবারও বুকটা মুচড়ে উঠে ফাহমিদার। অপুর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে নৌকায় উঠে পড়ে ও। মাঝি 'ফি আমানিল্লাহ' রব তুলে লগি ঠেলে দেয়, নৌকা এগুতে থাকে উত্তাল স্রোতস্বিনীর বুকে রাত্রির কালো পর্দা ভেদ করে।

২

আমরা তখন যশোরে থাকি। বয়স বার-তের হবে বৈকি। বাবার বদলিসূত্রে ওখানে এসেছি মাসখানেক হলো। একটা স্কুলে ভর্তি হয়েছি তখন, নতুন নতুন বন্ধুও জুটেছে। একদিন বিকেলে রাস্তায় হাঁটছি, হঠাৎই মধ্যবয়সী এক মহিলা এসে জড়িয়ে ধরলেন আমাকে। পরক্ষণেই অবশ্য নিজেকে ছাড়িয়ে নিলেন তিনি।

আমি ঘটনার আকস্মিকতায় ভড়কে গিয়ে বাসার দিকে ছুট লাগালাম। পরদিন শুক্রবার। বেশ বেলা করেই ঘুম থেকে উঠে মার কণ্ঠস্বর শুনে বসবার ঘরে গিয়ে দেখি সেই মহিলাটি। মা আমাকে ডাকলেন, "শুভ, এদিকে আসো। ইনি তোমার নতুন খালা- ফাহমিদা খালা"- সেই-ই প্রথম উনার সাথে পরিচয় হয় আমার। খুব আদর করতেন আমাকে। প্রতিদিনই এটা ওটা কিনে দিতেন। আমার পছন্দের সন্দেশ খাওয়াতেন বাসায় নিয়ে। তবে মাঝেমাঝেই খেয়াল করতাম তিনি আমাকে 'তুই তুই' করে বলছেন বেখেয়ালে।

'অপু' বলেও ডাকতেন আমাকে প্রায়ই। আমার অবশ্য নামটা ভালোই লাগত। প্রায় বছর দেড়েকের মতো ছিলাম আমরা যশোরে। তারপর হঠাৎই বাবার বদলি সূত্রে নারায়ণগঞ্জ চলে আসায় গত ২৬ বছরে আর ফাহমিদা খালার সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হয়নি আমার। যেমন হঠাৎ করে আমার জীবনে প্রবেশ ঘটেছিল তার, তেমন হঠাৎই বিদায় নেন তিনি।

৩

"আচ্ছা, কি হও তুমি ফাহমিদা খালার?"

"জ্বী, উনি দাদী হন আমার, জানেন বোধহয় উনার একটাই ছেলে....."

"সবুজ ভাই?"

"জ্বী, আমি তার বড় ছেলে, অনার্স থার্ড ইয়ারে এখন।"

"ও...." ফাহমিদা খালার লেখা চিঠিটা আবার পড়তে শুরু করলাম আমি।

".....অপুর সাথে আর কখনো দেখা হয়নি আমার। বাবারও কোনো খোঁজ পাইনি আর। হয়তো ওপারে পৌঁছাতেই পারেনি ওরা। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মামা-মামীর সাথে ফিরে আসার পর অনেক খুঁজেছি ওদের, কোনো সন্ধান পাইনি। তারপর অনেকদিন কেটে গেল। কিন্তু আমি আর অপুকে ভুলতে পারলাম না। আমার বিয়ে হল, সন্তান আসলো- তবুও অপু এক বিশাল শূন্যতা সৃষ্টি করে রইলো আমার জীবনে। এক বিকেলে হঠাৎ তোমায় দেখলাম রাস্তায়। তোমাকে বলা হয়নি কখনো; জানো, তুমি না দেখতে অবিকল অপুর মতো। আমি দৌড়ে গিয়ে তোমাকে জড়িয়ে ধরলাম। পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে পেয়ে তোমাকে ছাড়তেই তুমি দৌড়ে চলে গেলে। এরপর থেকে যতবারই তোমাকে দেখতাম, যতবারই তোমার সাথে কথা বলতাম- মনে হতো যেন এইতো অপু, আমার সামনেই আছে!

তোমার মনে আছে- আমি কিন্তু তোমাকে 'শুভ' বলে ডাকতাম না; ডাকতাম 'অপু' বলে? একদিন কাউকে না জানিয়ে হুট করেই তোমরা চলে গেলে। তোমাদের আর কোন খোঁজ পেলাম না। আমি আমার 'অপু' কে আবার চিরদিনের জন্যে হারিয়ে ফেললাম। তুমি তো এখন অনেক বড় লেখক হয়েছো।

পত্রিকায় তোমার ইন্টারভিউয়ে ছেলেবেলার কথা পড়ে তোমায় চিনতে পারলাম। তোমাকে খুব দেখতে চাইছিলাম, জানো তো? খুব জানতে ইচ্ছে করছিলো এই বয়সে আমার 'অপু' দেখতে কেমন হতো? আমি হয়তো আর বেশিদিন নেই। গত রাতেও অপুকে স্বপ্নে দেখলাম- তের বছরের হাস্যোজ্জ্বল অপু। ও বলেছিল, 'বুবু তাড়াতাড়ি চলে আয়। তোকে ছাড়া আর ভালো লাগছে না।' তোমার সঙ্গে দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হবে। অপু এত বছর পরেও আমার কাছে তের বছর বয়সের সেই চঞ্চল ছেলেটিই রয়ে যাবে। তোমার জন্যে শুভকামনা রইল।"

চিঠিটা শেষ করে নিশ্চুপ হয়ে বসে রইলাম খানিকক্ষণ। অজান্তেই চোখ দিয়ে দু'ফোটা অশ্রুজল গড়িয়ে পড়ল। অপু আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রাখলো।

"ফাহমিদা খালা এখন কোথায়?"

নিস্তব্ধতায় আরও কয়েক মুহূর্ত কেটে গেল। মৌনতা ভঙ্গ করে উত্তর এলো-

"দাদী মারা গেছেন আজ ন'দিন হলো।"

আমি আর 'রা'-টিও তুললাম না।

ও উঠে যাচ্ছিলো। হঠাৎ নিরস্ত হয়ে বলল, "দাদী আপনাকে দেওয়ার জন্যে আরেকটি জিনিস পাঠিয়েছিলেন।" আমি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ওর পানে চেয়ে রইলাম। ও ব্যাগ হাতড়িয়ে বের করে আনল, সূর্যের মৃদু আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠা- একটা রঙ ওঠা কাঠের ঘোড়া।

"বুবু, এটা তোর কাছে রাখ, যখন আমার কথা মনে পড়বে এটা দেখবি।"

Thoughts

Mirana Tahsin
Dept. of Environmental Science
Batch-2020

Gentle breeze touches my soul
My heart whispers to stop its howl.
Deep thoughts give a knock
Brain alert: check your locks!
Don’t let bad thoughts break you apart
Let’s just these freaking demons depart
I wonder how we can get rid of demons!
When it lives within us and comes out when we summon
Should we be seraphic or a demon according to need
But don’t allow any of them your soul to feed.
Darkness and fakeness are not same thing
Though it perplexes human being.
Fakeness has become quite a trend
Be cautious while choosing a friend.

খুশির ফেরিওয়ালা

সাবাহ্ মাহজাবিন সারোয়ার
অ্যাসিসট্যান্ট ইঞ্জি. (ইলেকট্রিক্যাল), চিফ প্লানিং
ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস

সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত হতে চলল। বাতাসের হিম ভাব জানান দিচ্ছে শীতকাল দরজায় কড়া নাড়ছে। বাসার সামনে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিলাম। অপেক্ষার প্রহর সাধারণত দীর্ঘতর অনূভুত হয়। আমার ক্ষেত্রেও ব্যতিক্রম ছিল না।

গেইটের উপর বেয়ে উঠা মাধবী লতার গুচ্ছ দুলছে, বাতাসের উৎসাহে। লাল লাল থোকা থোকা মাধবী লতার গুচ্ছের মধ্যে ফুট ফুটে সাদা ফুল। পাশেই বাঁশ ঝাড়ের পাতায় পাতায় বারি লাগার, শব্দ শীতল বাতাসকে দিচ্ছে পরিপূর্ণতা। সেই সাথে বাতাসে ভেসে আসছে হাসনাহেনার মিষ্টি গন্ধ। সব মিলিয়ে প্রকৃতি এক অপরূপ, রহস্যময় অবগুণ্ঠন নিয়ে রেখেছে। তখনো আমার জানা ছিল না, এই রহস্যময় অবগুণ্ঠনের মধ্যেই জীবনবোধের অন্যতম উপকরণ আমার জীবনে প্রবেশ করতে যাচ্ছে।

সামনে হঠাৎ গাড়ী এসে থামল। প্রথমবারের দর্শনে ঠিক নিশ্চিত হতে পারছিলাম না আমার হাতের তালুর উপর থাকা বস্তুটি প্রাণি নাকি তুলার পুতুল। সেই ছিল আমার সাথে প্রথম বান্টির দেখা।

বাড়ীতে যখন নিয়ে ফিরলাম তখন রাতের আকাশে সবচেয়ে উজ্জ্বল নক্ষত্র লুব্ধকের ন্যায়, দ্যুতি ছড়ানো অবাক চোখ দুটো দিয়ে চারপাশ ঘুরে ঘুরে দেখছিল। তুলার দলা স্বদৃশ্য ছোট্ট শরীরে উৎসুক দুটো চোখ। সৃষ্টিকর্তা যেন বাকশক্তির অভাব পূরণ করে দিয়েছেন প্রকাশক এই চোখ দুটো দিয়ে। পৃথিবীতে আসার সময়ই মাত্র দুমাস। এর মধ্যে নতুন বাসা আর নতুন মানুষ। নতুন পরিবেশে খাপ খাইয়ে নেয়ার চমৎকার দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল ছোট্ট বান্টি। একটা ঘটনা বললে পরিষ্কার হবে বিষয়টি-

বাড়ির মধ্যে একতলা থেকে অন্য তলায় যেতে ছোট্ট একটি সিঁড়ি আছে। সিঁড়ির প্রতি ধাপের উচ্চতা ছোট্ট বান্টির উচ্চতার সমান। কয়েকদিনের মধ্যেই অবাক হয়ে খেয়াল করলাম, বান্টি নিজে নিজে দেয়াল টপকানোর মত করে সিঁড়ির ধাপগুলো দিয়ে ওঠা শিখে ফেলল। ভীত কিন্তু দৃঢ় পদে চলার সেই প্রতিজ্ঞা সেদিন আমাকে অবাক করেছিল।

কিন্তু তার চেয়ে বেশি অবাক করেছিল বান্টির ভালবাসার পরিধি ও ক্ষমতা। আমি,বাবা কিংবা আমার বোন, সবার কাজ শেষে বাড়ি ফেরার সময়ের জন্য তার থাকে অধীর প্রতীক্ষা। দরজা দিয়ে ঢোকা মাত্রই লেজ নেড়ে, নেচে নেচে জানান দেয় তার আনন্দের। বাড়ি ফেরার সাথে সাথে তাঁর তুমুল উত্তেজনা দেখে মনে হয়েছিল বাড়ি ফেরা যে কত আনন্দের! অথচ নিয়মিত বিধায় একে অবধারিত ধরে এর আনন্দ আমরা ভুলতে বসেছি। জীবনের এই ছোট্ট ছোট্ট নিয়মিত আনন্দের উৎসগুলোকে খনির মত বের করার অবাক করা ক্ষমতা আছে বান্টির।

বাড়ীতে থাকে বিধায় আমার মা যে এই ভালবাসার উষ্ণতা থেকে বঞ্চিত হয় তা কিন্তু না। বরং বান্টির দায়িত্ববোধ ও সার্বক্ষণিক সাহচর্য দেয়ার গুণটি তাঁর বেলায়ই সবচেয়ে বেশি প্রকাশ ঘটে। আমরা রসিকতা করে বলি মানুষের ছায়া একটি, কিন্তু আম্মুর ছায়া দুটি। কারণ, বান্টি আম্মুর ছায়ার ন্যায় তাঁর অবিচল সঙ্গী সর্বক্ষণ।

সকালে আম্মুর একটা বড় সময় কাটে বাগানে। আম্মু যখন মাটি নিংড়িয়ে দেন কিংবা গাছ ছেটে দেন, বান্টি উৎসুক দৃষ্টিতে সেই কাজ প্রত্যহ অবলোকন করে। কোন ফাঁকি নেই সেই দেখায়। এই সময় তাঁর কথা হয় উঠানে আসা শালিক জুটি কিংবা ফিঙের সাথে। কোন গাছে নতুন ফুল এলে সৌন্দর্যপিপাসু বান্টি প্রাণ ভরে তাঁর ঐশ্বরিক ঘ্রাণ শক্তি দিয়ে সেই ঘ্রাণ নেয়। তারপর দৌড়ে এসে মাকে জানান দিয়ে যায় নতুন ফুলের কথা। আম্মুর টিভি দেখার সময় কিংবা রান্নার সময়ও এককোণে চুপচাপ বসে তাঁকে সঙ্গ দেয় বান্টি। কোন ব্যত্যয় নেই এই কার্যক্রমের। দিন শেষে আম্মু যখন ঘুমোতে যায় সেখানেও সঙ্গ দিতে ব্যর্থ হয় না বান্টি। মা'র খাটের নিচে নিজের জায়গা ঠিক করা আছে যে তার ! প্রতিদিন আম্মু ঘুমাতে গেলে সেখানেই ঘুমোতে যায় সে। এই সাহচর্য ও দায়িত্ববোধ যে শুধু ভালোবাসার সঞ্চার করে আমার মাঝে তা নয়। অনুশোচনা দেয়, কষ্ট দেয়। আমাকে ভাবায় এতটা দায়িত্ব আমি কি পালন করতে পেরেছি আমার মায়ের প্রতি ? দিতে কি পেরেছি এতটা সাহচর্য ?

আরো লজ্জায় পড়ে যাই যখন দেখি তার দায়িত্ববোধ, আলস্যতাকে নিয়ে গেছে শুন্যের কোঠায়। দু'বছরের মধ্যে বান্টি কখনো দরজা খুলতে যায়নি তা হয়নি। ঘণ্টার শব্দে, প্রচণ্ড ঘুম, আলস্য উপেক্ষা করে বান্টি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিয়ে দরজা খুলতে যায় প্রতিবার। আগত ব্যক্তি পরিচিত হলে নেচে গেয়ে অভিবাদন জানায়। অপরিচিত হলে চিৎকার করে বাড়ির সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই দায়িত্ববোধের বলেই প্রতিদিন সন্ধ্যা হতেই নিজেই তৈরি হয়ে যায় বাবার সাথে দৌড়াতে সঙ্গ দিতে। কোনদিন ভুল হয় না আব্বুর অলস বারান্দার সময়গুলোতে সাথে বসে থাকতে।

তবে সবচেয়ে অবাক করে আমাকে তার আনন্দের কারণ, খুশির সংজ্ঞায়ন। জীবনে সুখী হওয়ার কারণগুলো যে আমাদের আশে পাশেই অযত্নে ছড়ানো থাকে তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমায় বান্টি। চার দেয়ালের ছোট্ট পৃথিবীতে জীবনের আনন্দগুলোর উৎস বস্তুকেন্দ্রিক নয় এটা সে খুব ভালভাবে উপলব্ধি করতে শিখিয়েছে আমায়। জগদ্দল পাথরের ন্যায় চেপে থাকা দুঃখগুলোকে ঠেলে সরিয়ে দেয়ার শক্তিগুলো আশপাশ থেকেই সংগ্রহ করা সম্ভব তা বান্টি খুব ভাল করেই জানে। এজন্যই বান্টি আনন্দ খুঁজে পায় পরিবারের সদস্যদের নীড়ে ফেরার মধ্য দিয়ে, গাছে নতুন ফুল আসার মধ্যে। জীবনের আহ্বানে, প্রতিটি দিনের সূচনা করে নতুন উদ্যম নিয়ে। সকালের শুভ্রতাকে আলিঙ্গনের যে উদ্যম তা আমাদের থাকে না। জরা, ক্লান্তি আমাদের আঁকড়ে ধরে। কিন্তু এই উদ্যম, নতুন দিনের আনন্দ নিয়ে প্রত্যহ সবাইকে অভিবাদন জানায় বান্টি। সকালের উৎফুল্লতা দিয়ে জানান দেয় সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত দিনটির সর্বোত্তম ব্যবহারের জন্য সে তৈরি এবং এই সুযোগ পাওয়ায় সে আনন্দিত। কিন্তু প্রতিটি দিন যে একটি সুযোগ, নতুন করে বাঁচার কারণ তা আমাদের কতজন মনে রাখতে পারি ?

কৃতজ্ঞতাবোধ বান্টির আনন্দের এই সংজ্ঞায়নকে দিয়েছে পূর্ণতা। জীবনের ছোট ছোট প্রাপ্তিগুলোতে বান্টির কৃতজ্ঞতাবোধ আমায় অবাক করে দেয়। প্রতিবার খাবার খেয়ে মার কাছে গিয়ে, দ্যুতি ছড়ানো চোখ দুটি দিয়ে নির্বাক সারমেয় ছানার সে দৃষ্টি তার কৃতজ্ঞতাবোধ এর জানান দেয়।

বাসার নিয়ম অনুসারে মাসে একবার খেলনা কিনে দেয়া হয় বান্টিকে। কিন্তু এই করোনাকালীন লকডাউনের মধ্যে তা সম্ভব হয়নি। কিন্তু নিজের পুরোনো খেলনাগুলো নিয়ে বান্টির কোন ক্লান্তি বা অনাগ্রহ কখনো কাজ করে না। অল্পতে তুষ্ট হওয়ার সে গুণ আমাকে মুগ্ধ করে। বাসায় কেউ বেড়াতে এলে, নিজের পুরাতন খেলনাগুলোই খুঁজে নিয়ে এগিয়ে দিচ্ছে আনন্দ ভাগাগাগি করে নিতে। ফাটা বল, ছেঁড়া পুতুলের জন্য সেকি মমতা তার! সময়ের সাথে সাথে প্রিয় জিনিসের আবেদন যে একদম কমে না, বরং জিনিসগুলোকে সমানভাবে ভালবাসা যায় ঠিক আগের মতন-সেটা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে বান্টি।

দায়িত্ববোধ, উজাড় করে ভালবাসা, কৃতজ্ঞতাবোধ এগুলোর কথা বই পুস্তকে পাওয়াই যায়, কিন্তু হৃদয় দিয়ে তখনই অনুভব করা যায় যখন নিজের সাথে ঘটে বা সামনে ঘটে। আমার জীবনে বান্টির বিশাল অবদান নির্বাক হয়েও সার্থকভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ বোধগুলোর সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। তারচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ

সুখের উৎসের সন্ধান দেয়ার জন্য। জীবনে সুখী সবাই হতে চায়, কিন্তু সুখের পিছনে দৌড়াতে গিয়ে, সুখের সরল সমীকরণই ভুলতে বসেছি আমরা। জীবনের এই সহজ হিসেব শিখানোর জন্য কৃতজ্ঞ আমি চিরকাল বান্টির কাছে।

নোবেল বিজয়ী চিলির সাহিত্যিক পাবলো নেরুদা কবিতায় বলেছিলেন,

‘and I, the materialist, who never believed
in any promised heaven in the sky
for any human being,
I believe in a heaven I’ll never enter.
Yes, I believe in a heaven for all dogdom
where my dog waits for my arrival
waving his fan-like tail in friendship.’

নেরুদার মত আমিও জানি না স্বর্গে আমার ঠাঁই হবে কিনা। কিন্তু আমি জানি, পৃথিবীর ওপারে লেজ নেড়ে আমার জন্য বান্টি ঠিকই অপেক্ষা করবে, ঠিক যেমন এখন আমার বাড়ি ফেরার প্রতীক্ষা করে।

Silent Cry

Sheikh Sourov
Dept. of Business Administration in Finance & Banking
Batch: 2017

Tears flow down to her feet,
To be one part of thee,
But she doesn't care
Hiding herself in the tree.
In the moonlight night
When I talked to the moon
It smiles and says-
'She'll love you soon.'
But the days have passed
Since I saw her last
But the moon continues-
'She'll love you must'
The days and nights
I passed beside her,
The more I feel
The need of her.
But my tears rolled down
To that golden feet
Hope that she'll forgive
And love me a bit.

নতুন জীবন, অচেনা পৃথিবী, একটি দুঃস্বপ্ন ও আমি

জাওহারা রহমান জর্জিয়া
ডিপার্টমেন্ট অব সোশিওলজি
ব্যাচ-২০১৯

৮ মার্চ, ২০২০

সকালে ভার্সিটি গেলাম, পুরোদিন একটা কথা কিছুক্ষণ পরপরই বাতাসে ভেসে আসছিল কানে। একটা নতুন শব্দ। আমি এই শব্দের সাথে আগে পরিচিত ছিলাম না। তাই প্রথম এক দুইবারে ঠিক বুঝতেও পারিনি। আমিতো মুজিব বর্ষ এবং একাধিক ক্লাবের বিভিন্ন উদযাপন পরিকল্পনা নিয়ে ব্যস্ত। প্রতিদিন রাস্তায় লাল রঙয়ের ঘড়ির দিকে নজর রাখতাম। পুরো দেশে একটা উৎসব উৎসব আমেজ। সেদিন বাসায় এসে শুনলাম বাংলাদেশে প্রথম "করোনা" ধরা পড়ে। হ্যাঁ অচেনা অপরিচিত নামটা এবার আমি নিমিষেই চিনতে পারি। এরপর শুনি দেশে করোনা আক্রান্তর মৃত্যু। এটাই ছিল করোনার কবলে প্রথম মৃত্যু। মোটামুটি সবার মধ্যেই একটা চিন্তার ছাপ পড়ে যায়। বাসায় আসার পর থেকেই জানি না কেনো মনটা বিষাদগ্রস্ত ছিল..হয়তো সবকিছু ফেলে চলে আসায় বা হয়তো ভবিষ্যৎ এ যা হবে তার কোনো আইডিয়া না থাকায়!!

এর মধ্যে এক ঘটনা ঘটে গেলো তাও বাসার একদম সামনেই। বাসার সামনের সগীর চাচার পুরো পরিবার নাকি করোনা আক্রান্ত। তার স্ত্রী, ২ ছেলেসহ সবাই। সে একটা হাসপাতালে চাকরি করতেন। করোনা পজিটিভ জেনেও লোকাল বাস এ চলাচল করেছেন। এমনকি আশপাশের কাউকে জানাননি পর্যন্ত তাদের অসুস্থতার কথা। শিক্ষিত একজন মানুষ হয়ে এটা কেনো করলেন বুঝতে পারলাম না। তার স্ত্রীর অবস্থা খারাপ হওয়ায় তাকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেই সাথে আমাদের বাসাসহ আশপাশের আরও কিছু বাসা লকডাউন করে দিয়ে গিয়েছে রেড ফ্লাগ দিয়ে।

বাসার সবাই খুব চিন্তায় পড়ে গেলাম। আর আমার মনের মধ্যে অন্য ভয় ঢুকে গিয়েছিলো। আমি লোকাল বাস এ বেশি যাতায়াত করতাম। আমি ভয় পেতে শুরু করলাম। বন্ধুদের বলে তারাও মজায় উড়িয়ে দিতো, "আরে, তোর হলে তোহ আমারও হবে, হাহা"।

আরও ২-৩ দিন কাটলো। আমার জ্বর, কাশিও আছে। মা কে বললে মা বলে ঠিক হয়ে যাবে সিজন চেঞ্জ এর জন্য হতে পারে। জ্বর হওয়ায় বাসার মানুষদের নিয়ে আমার চিন্তা আরও বেড়ে যায়। আমার বাসায় আমার ভাই আছে আর আমাদের উপরের ফ্লাটে থাকা আমার কাজিন ছোট বোন যে দিনের পুরোটা সময় আমাদের বাসায় কাটাতো। ওর সাথে আমার সময় কাটানো হয় সব থেকে বেশি। আমি ওকে কোলে নেয়াই বন্ধ করে দিলাম। আরও একদিন কেটে যাওয়ার পর আমি চাচ্চুকে জোর করেই বললাম যেনো আমার টেস্টটা করানো হয়। চাচ্চু শুনলো আমার কথা। টেস্ট করে এলাম সেদিন গিয়ে।

২৭ মার্চ, ২০২০

আজকের আমার টেস্ট এর রেজাল্ট আসার কথা। আমার শরীর আরও খারাপ হয়েছে এতদিনে। সেদিন দুপুর ১২ টায় রিপোর্ট দেওয়ার কথা..কে যাবে রিপোর্ট আনতে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি ! আমি শুনতে পাচ্ছিলাম। এই

সিদ্ধান্তটা চাচ্চুই নিলেন। কারণ বাবা মারা যাবার পর উনিই আমাদের মাথার উপরের একমাত্র ছাদ। উনি গেলেন!

ঘন্টা চারেক পর বাসায় ফিরে এলেন, আমার রুমে ঢুকলেন আমি তখন কাঁথাগায়ে শুয়ে ছিলাম।

আমার মুখ কালো ছিলো। ছোটবেলায় আমার একবার টাইফয়েড হয়েছিলো আমি তখন ৫ম শ্রেণিতে পড়ি। আমার অবস্থা খুবই খারাপ ছিলো। বাবা একদিন আমাকে খুব জোরে জড়িয়ে ধরে বলছিলেন, 'কিচ্ছু হবে না মা, আমরা তোকে আরও ভালো ডাক্তার দেখাবো'।

আর এইবার চাচ্চু এসেও আমার খাটেও বসলেন না। মুখ কালো করে ওই কথাটাই বলেন, "তুই ঠিক হয়ে যাবি মামনি, কিচ্ছু হবে না, আমরা তোকে আরও ভালো ডাক্তার দেখাবো"।

আমি বুঝতে পেরেছিলাম। চাচ্চু এইবার আমার কাছে আসতে সংকোচ বোধ করছেন। দূর থেকে বললেন। কি রোগ বাসা বেঁধেছে আমার শরীরে যে আমার আপন মানুষটাও আমার কাছে আসতে ভয় পাচ্ছে।

রাতে খবরে শুনলাম ৪৮ জন পজিটিভ। হ্যাঁ, তার মধ্যে আমিও একজন।

আমাদের বাসায় আমি, মাম্মি, আর আমার ছোট্ট ভাই। করোনা পজিটিভ শোনার পর থেকেই মাম্মি বাসা থেকে বের হওয়া বন্ধ করে দেন। চিন্তা থাকে ছোট ভাইকে নিয়ে। আমাদের বাসার কাজের মহিলার আসাও বন্ধ। আমি রুম থেকে বের হই না। আমি পরদিন সকালেই আমার কাছের ২ বন্ধু, ১ বান্ধবী যাদের সাথে আমি বেশি মিশতাম তাদের জানাই। তাদেরকেই একবার টেস্ট করে আসার জন্য বলি। আমার মা-ভাই চাচ্চু আর বাসার সবাই টেস্ট করে এসেছেন রেজাল্ট আসেনি এখনো।

দিনে দুইবার তিনবার কল আসে আত্মীয়দের। আমি কেমন আছি এটার থেকে বড় প্রশ্ন আমার কিভাবে হলো। আমি বাসায় একটা রুমের মধ্যে থাকতাম। সবার রেজাল্ট নেগেটিভ আসে। আমার দুশ্চিন্তা একটু হলেও কমে। বেশি চিন্তা ছিলো আমার ঐ ছোট বোনটাকে নিয়ে। ডাক্তারদের কথা মত কিছু ওষুধ খেয়ে দিন কাটাচ্ছিলাম। ফেসবুকে তখন আমার বয়সি সবার একটাই স্ট্যাটাস দিন কাটাবে কিভাবে? সময় কাটাবে কিভাবে? তখন আমি দিন রাত ভাবতাম আমি ঠিক হবো কবে। আবারও সব ঠিক হবে তো!!! আমার তোহ কতগুলো স্বপ্ন এখনো পূরণ করাই হলো না। কয়েকটা দিনে আমি খুব বড় হয়ে উঠেছিলাম। জীবনের মানে নতুন করে শিখছিলাম। বাংলাদেশে তখনো মহামারীর প্রকোপটা শুরু হয়নি। কিন্তু দিন দিন ২-৩ জন করে রোগীর সংখ্যা আর মৃত্যু সংখ্যাও বাড়ছিলো। আর হ্যাঁ সুস্থ হওয়া রোগীর সংখ্যাও।

আমি প্রতিনিয়ত সৃষ্টিকর্তাকে ডাকতাম। আমি দেখেছিলাম। খুব কাছের মানুষরাও কিভাবে দূরে সরে যায়। একটা রোগ কিভাবে মানুষের সাথে মানুষের সম্পর্ক এর দূরত্ব বাড়াতে পারে।

আমি অনেকদিন অসুস্থ ছিলাম। হাসপাতালে ভর্তি হতে হয়নি। কিন্তু মানুষের থেকে দূরে সরে গিয়েছিলাম অনেক। আমার রেজাল্ট পজেটিভ থেকে নেগেটিভ হলো।

আমি সুস্থ হয়ে উঠলাম। আমি সেই ভাগ্যবান কয়েকজনের মধ্যে অন্যতম। যাকে ভাইরাস হারাতে পারেনি।

বাংলাদেশে এখন দিন দিন মহামারী আকার ধারণ করছে। দিন দিন মানুষ মারা যাচ্ছে। এর মধ্যে ফেসবুকে আরও একদল মানুষকে দেখানো হতো, যারা খেতে পারতো না। পুরো বাংলাদেশ যখন লকডাউন এ তখনও তারা খাবারের আশায় রাস্তায় নামছিলো। আমি সুস্থ হবার পর "লাল সবুজ সোসাইটি" তে যুক্ত হই। ঢাকার বেশ কিছু জায়গার গরীব অসহায় মানুষদের সাহায্য করার চেষ্টা করি। রোজার মধ্যে রাস্তায় নেমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছি ইফতার। এমনকি ঈদের দিনও খাবার নিয়ে পৌঁছে গিয়েছিলাম তাদের কাছে।

সারাদিন কাজ করার পর রাস্তার বাচ্চাদের হাতে খাবার আর বেলুন তুলে দিলে তারা আমাদের যে হাসিটা ফেরত দিতো সেটা ছিলো আমার করোনাকালের শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা।

একটা ভাইরাস আর থমকে গেলো পুরো বিশ্ব। আমরা খুব কাছের মানুষের আর্তনাদও শুনতে চাই না। এড়িয়ে যেতে চাই সবকিছু। আজকাল মানুষ মারা গেলে তাদের লাশ দাফন করার জন্য মানুষ পাওয়া যাচ্ছে না। মানবজাতির কোন অভিশাপ হিসেবে এই ভাইরাস এসেছে তা আমার জানা নাই।

আমার কাছে করোনাকালের অভিজ্ঞতা মানে আমার জীবনে ঘটে যাওয়া খুব বাজে একটা সময়ের সাক্ষী হওয়া আর সেই সাথে মানুষের খুব কাছে গিয়ে তাদের সাহায্য করা। আমাকে জীবন আরও একবার সুযোগ দিয়েছে হয়তো আমার স্বপ্নগুলো সত্যি করার।

দি গার্ডেনে একদিন

ফাতিন ইশরাক
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং
ব্যাচ-২০১৯

পপ কালচারের অন্যতম প্রসিদ্ধ নাম দি বিটেল্‌স, অনেকেই যে ব্যান্ডকে পরিয়ে দিয়েছেন রক এন্ড রোল ইতিহাসের শ্রেষ্ঠত্বের মুকুট। ১৯৬০ সালে গঠিত এই ব্যান্ডকে এক অন্য মাত্রায় নিয়ে যান লিভারপুলের চার তরুণ জন, পল, জর্জ ও রিংগো। এক দশকের বিটেলম্যানিয়া ও অসংখ্য অর্জনের পর নানাবিধ কারণে ভেঙে যায় 'দি ফ্যাব ফোর'। স্বাভাবিকভাবেই মিডিয়ায় সৃষ্টি হয় ব্যাপক হৈ চৈ। আর সবাই যখন ওসব নিয়ে বাক-বিতণ্ডায় ব্যস্ত তখন সর্বকনিষ্ঠ ও লাজুক বিটেল খ্যাত জর্জ হ্যারিসন করে দেখান এমন কিছু যা ব্যক্তিগত সাফল্যের অনেক ঊর্ধ্বে।

জর্জকে নিয়ে গর্ভবতী থাকাকালীন তাঁর মা প্রতি রবিবার রেডিও ইন্ডিয়া নামক শো'তে সেতার-তবলার সুর শুনতেন। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, সেই সুর তাঁর গর্ভের সন্তানের জন্য প্রশান্তি বয়ে আনবে। অলৌকিকভাবে ষাটের দশকের মাঝামাঝি দিকে জর্জ হ্যারিসনও এই ইন্ডিয়ান মিউজিকের প্রতি প্রবল আসক্তি অনুভব করেন যখন তাঁর পরিচয় হয় উপমহাদেশের বিখ্যাত ভারতীয় বাঙ্গালি সেতারপণ্ডিত রবি শংকরের সাথে। বেশ অবাক করে দিয়েই জর্জ তাঁর কাছে সেতার শেখার আবদার করে বসেন। প্রথমত ছাত্র-শিক্ষক হিসেবে সম্পর্কটির শুরু হলেও সময়ের সাথে তা পরিণত হয় এক গভীর বন্ধুত্বে।

১৯৭০ সাল। সময়টা খুবই খারাপ যাচ্ছিলো তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের। আগস্ট থেকে শুরু হওয়া বন্যায় তলিয়ে যায় দেশের অর্ধেক। তার রেষ কাটতে না কাটতেই নভেম্বরে ইতিহাসের সবচেয়ে বিধ্বংসী ঘূর্ণিঝড় 'ভোলা' কেড়ে নেয় প্রায় ৫ লক্ষ প্রাণ, নিঃস্ব করে অগণিত জীবন। কিন্তু এই দুঃস্থ মানুষগুলোর পাশে এসে দাঁড়ানোর ব্যাপারে পাকিস্তান সরকারের পদক্ষেপ ছিলো অপ্রতুল এবং প্রশ্নবিদ্ধ।

তৃতীয়ত যে আঘাতটি আসে তার প্রবলতা আরো তীব্রতর। তা কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ নয়, বরং মানুষের উপর মানুষের নৃশংসতা। ৭ই ডিসেম্বর হয়ে যাওয়া সাধারণ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তর তো দূরের কথা, রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান উল্টো মিলিটারির দ্বারা শুরু করেন গণহত্যা।

এরপরের গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস আমাদের সবারই কম বেশি জানা। দুঃখের বিষয় বহির্বিশ্বে আমাদের মুক্তির আন্দোলন একরকম ধামা চাপাই পড়ে যায়। পাকিস্তান এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংস্থাপিত কুটনৈতিক সম্পর্কের মাধ্যমে এটিকে 'সিভিল ওয়ার' হিসেবে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। জাতীয় গণমাধ্যমগুলোও ছিলো অবৈধ সরকারের নিয়ন্ত্রণেই। এতে পাকিস্তানি মিলিটারির পাশবিক নরহত্যা ও ধর্ষণসহ লাখো মানুষের ঘড়ছাড়া হয়ে বেঁচে থাকার লড়াই এর ব্যাপারে অল্প সংখ্যক মানুষই অবগত ছিলো। এই অল্প সংখ্যক মানুষের একজন ছিলেন রবি শংকর, যার মনে এই বর্বরতা বিশেষভাবে দাগ কাটে।

রবি শংকরের আদি পৈত্রিক বাড়ি ছিলো বাংলাদেশের নড়াইল জেলায়। বাঙালিদের সাথে তাঁর এক সৃষ্টি-সম্বন্ধীয় বন্ধন ছিলো বলা যেতে পারে। প্রায় ১ কোটি বাঙালি প্রাণের মায়া নিয়ে যখন ভারতের বিভিন্ন জায়গার ৮২৯টি

রিফিউজি ক্যাম্পে আশ্রয় নেয় তখন সৃষ্টি হয় তুমুল বিশৃঙ্খলার। অতিরিক্ত মানুষ হওয়াতে বহিরাগত সাহায্য ছাড়া পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ও চিকিৎসা সরবরাহ করা হয়ে পড়েছিল অসম্ভব। ফলস্বরূপ শুরু হয় দুর্ভিক্ষ ও মহামারী। যুদ্ধের মৃত্যু টালির সাথে ক্রমাগতই যোগ হতে থাকে এসকল অনাহারী নারী-পুরুষ, শিশু। এই নির্মমতা রবি শংকরকে চুপ করে বসে থাকতে দেয়নি।

১৯৭১ সালের জুন মাসের কথা, তিনি তখন হতাশাগ্রস্ত হয়ে লস এঞ্জেলসে অবস্থান করছিলেন। পাওলো চেলহো তাঁর বিখ্যাত বই দি আলকেমিস্টে বলেছিলেন কেউ কিছু চাইলে গোটা বিশ্ব তাকে সেটি পেতে সাহায্য করে। এই সূত্রের প্রমাণ হিসেবেই যেন ওই সময়ে অল্প কিছুদিনের কাজে লস এঞ্জেলসে হাজির হন জর্জ হ্যারিসন। রবি শংকর পুরো বিষয়টি খুলে বলেন জর্জকে, আর প্রাথমিক ভাবে ২৫ হাজার ডলার অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করে তা ইউনিসেফের তহবিলের মাধ্যমে বাঙালি রিফিউজিদের কাছে পৌছে দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু বিস্তারিত শুনে জর্জ হ্যারিসনের মনে হয়েছিলো আরো বড় কিছু করা উচিৎ। তাই তিনি প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেন একটি কনসার্টের, দীর্ঘ এক মাসব্যাপী চালান ফোন কল। আর ফোনের ওপাশ থেকে ইতিবাচক উত্তর আসে বিটেলসের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা জন লেনন, প্রখ্যাত ব্লুজ রক গিটারিস্ট ও গায়ক এরিক ক্ল্যাপটন, বিটেল্‌স ড্রামার রিঙ্গো স্টার, ২০১৬ সালে সাহিত্যে নোবেল প্রাপ্ত গায়ক-গীতিকার বব ডিলান, কি-বোর্ডিস্ট বিলি প্রেস্টন, পপস্টার লিওন রাসেল এবং বিখ্যাত ব্যান্ড ব্যাড ফিংগারসহ অনেক মিউজিশিয়ানের কাছ থেকে। বাংলাদেশকে অগ্রাহ্য করে পাকিস্তানকে সব রকম সহযোগিতা করা আমেরিকার মাটিতে বাঙালিদের জন্য বড় ধরনের দাতব্য কসার্ট করা স্বয়ং জর্জ হ্যারিসনের জন্যও যথেষ্ট কষ্টসাধ্য ছিলো। কিন্তু তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার পর অবশেষে ২৭ই জুলাই এক প্রেস কনফারেন্সে কন্সার্ট ফর বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। একই দিনে তাঁর লেখা ও সুর করা গান "বাংলাদেশ" মুক্তি পায় যেটি একটি "টপ ৩০" হিট হয়ে ওঠে। ১লা আগস্ট, রবিবার দুপুর ২:৩০ এবং রাত ৮টায় দুটি কনসার্টের আয়োজন করা হয়, ভেনু নিউ ইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেন। দ্রুত এই খবর ছড়িয়ে পরে গানপাগল জনতার মাঝে, উৎসুক হয়ে ওঠে তারা। দি বিটেল্‌স ভাঙনের পর এটি হতে যাচ্ছিলো ৩ বিটেলসের প্রথম রিইউনিয়ন, যদিও অনিবার্য কারণে পরবর্তীতে জন লেননের আসা হয় না। তবুও মানুষের উৎসাহে কোন টান পড়ে না। মাদকাসক্তির সাথে যুদ্ধরত এরিক ক্ল্যাপটন কি গিটার বাজাতে প্রস্তুত? ২ বছরের লম্বা নিরবতা ভেঙে কি বব ডিলান আদৌ আবার স্টেজে ফিরে আসবেন? মজার ব্যাপার হলো এই ২য় প্রশ্নের উত্তর জর্জ হ্যারিসনেরও জানা ছিলো না, সেজন্য পারফর্মার্স লিস্টে ডিলানের নামের পাশে দিয়ে রেখেছিলেন একটি "?"।

বহুল প্রতীক্ষিত দিনটি এলো। টিকেট ছাড়ার এক ঘন্টার মধ্যেই সব বিক্রি হয়ে যায়, উপস্থিত হয় প্রায় ৪০ হাজার দর্শক। প্রথম কনসার্টে সেতার নিয়ে এলেন পন্ডিত রবি শংকর, সরোদে ছিলেন আলী আকবর খান, তবলায় ওস্তাদ আল্লা রাখা কুরেশি এবং তানপুরায় কমলা চক্রবর্তী। তাদের আধ্যাত্মিক পরিবেশনা চলে টানা ৪৫ মিনিট। এরপরে বিরতির সময়ে বাঙালিদের করুণ চিত্র তুলে ধরা হয় নেদারল্যান্ডের এক চ্যানেলের ধারণকৃত ভিডিওর মাধ্যমে। দ্বিতীয় কনসার্টে একে একে স্টেজ কাঁপান জর্জ হ্যারিসন, বিলি প্রেস্টন, রিংগো স্টার এবং লিয়ন রাসেল। সলিড গিটারের জায়গায় ভুল করে হলো গিটার আনা এরিক ক্ল্যাপটনের জাদুরও ছিলো না কোন কমতি। নির্দিষ্ট স্লটের সময় বব ডিলানের আগমনে চমকে যান জর্জ, আর দর্শক ফেটে পরে উল্লাসে। জর্জ হ্যারিসনের "বাংলাদেশ" গানটি দিয়ে শেষ হওয়া কনসার্টটির মাধ্যমে পুরো বিশ্বের দৃষ্টিকোণ পাল্টে দিয়েছিল এই "সুপারগ্রুপ"। অর্থ বা ক্যারিয়ার নয়, শুধুমাত্র মনুষ্যত্বের খাতিরে এসে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সেদিন দাঁড়িয়েছিলেন তাঁরা সবাই।

২৫,০০০ এর জায়গায় এই কনসার্ট থেকে উঠে আসে ২ লক্ষ ৪৪ হাজার ডলারের কাছাকাছি অর্থ সাহায্য যা আগস্টের ১২ তারিখ ইউনিসেফের ফান্ডে হস্তান্তর করা হয়। পরবর্তী সময়ে কনসার্টটি অ্যালবাম আকারে মুক্তি পেয়ে গ্র্যামি জিতে নেয় এবং এর সংক্রান্ত সকল আয় দি জর্জ হ্যারিসন ফান্ড ফর ইউনিসেফে জমা হয়ে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশ ও বিশ্বের মানুষের সাহায্যে আসে। তবে শুধুমাত্র অর্থের দিক দিয়ে বিবেচনা করলে এই কনসার্টকে ছোট করা হবে। কারণ এই কনসার্টই বহির্বিশ্বের মানুষের মনের মানচিত্রে এঁকে দিয়েছিল বাংলাদেশের ছবি। রবি শংকরের

মতে এক রাতেই পুরো বিশ্ব জেনে গিয়েছিলো বাংলাদেশের নাম, যা একটি মিরাকল। এর মাধ্যমেই বাঙালির ওপর চলমান নিপীড়ন হয়ে ওঠে একটি আন্তর্জাতিক ইস্যু। শুধু তাই নয়, এটি ছিলো ইতিহাসের প্রথম বড় দাতব্য কনসার্ট যার সূত্র ধরে ১৯৮৫ এর লাইভ এইডসহ সময়ের সাথে অসংখ্য দাতব্য কনসার্ট অনুষ্ঠিত হয় এবং পুরো ব্যাপারটি সঙ্গীত-সংস্কৃতির সাথে মিশে যায়। বিশ্বকে জর্জ হ্যারিসন যেন দেখিয়ে দেন কিভাবে গান গেয়ে লক্ষ প্রাণ বাঁচাতে হয়। একজন বাঙালি হিসেবে জর্জ হ্যারিসনের ব্যাপারে তাঁরই গানের সূত্র ধরে এতটুকুই বলতে পারি - While his guitar gently wept, Humanity looked at him and cried tears of joy।

Bibliography

G. Harrison, O. Harrison and D. Taylor, I, Me, Mine.

G. Thomson, George Harrison: Behind The Locked Door.

“Refugees”, Bangladesh Genocide Archive. [Online]. Available: http://www.genocidebangladesh.org/refugees/. “Refugees”, Bangladesh Genocide Archive. [Online]. Available: http://www.genocidebangladesh.org/refugees/.”Concert for Bangladesh - George Harrison”, George Harrison. [Online]. Available: https://www.georgeharrison.com/films/the-concert-for-bangladesh/.

C. Pillay, “How music influenced the War of Liberation of Bangladesh”, Dailyo.in, 2020. [Online]. Available:https://www.dailyo.in/politics/concert-for-bangladesh-east-pakistan-music-george-harrison-pt-ravi-shankar/story/1/33437.html.

“Concert for Bangladesh - Liberation War Museum”, Liberationwarmuseumbd.org. [Online]. Available: https://www.liberationwarmuseumbd.org/concert-for-bangladesh/.

R. Ahmed, “The Concert For Bangladesh - The First Charity Concert, Through The Eyes of a Bangladeshi Man”, Beatlesnumber9.com. [Online]. Available: http://beatlesnumber9.com/bangladesh.html.

S. Sharif, “কনসার্ট ফর বাংলাদেশ : মানবতার অনন্য দৃষ্টান্ত”, Roar.media, 2017. [Online]. Available: https://roar.media/bangla/main/history/concert-for-bangladesh.

M. Stancati, “When Ravi Shankar Met George Harrison”, WSJ, 2012. [Online]. Available: https://blogs.wsj.com/indiarealtime/2012/12/12/when-ravi-shankar-met-george-harrison/.

R. Buist, “Concert for Bangladesh almost didn’t take place”, Ft.com, 2019. [Online]. Available: https://www.ft.com/content/873fdee6-6767-11e9-9adc-98bf1d35a05

It's You

Sumaiya Mehreen Meem
Department of Economics
Batch: 2019

I heard the bright tinkle of the welcome bell. The door swung open signalling the arrival of a new customer. A gust of fresh wind washed over, accentuating the sweet coffee-mixed aroma in the room before the door slammed shut. My eyes landed on the familiar figure whom my heart had been craving to see. You. You, who smiled with your whole face. A faint blush crept onto my cheeks as I fumbled with your order. I shouldn't have been so since it's your regular. Your presence was so regular. I heard the bell ringing again. But only inside my head. Like the red strings of fate making the bell jingle. And I wondered if that's what heart flutter feels like.

It took us four months to get past just shy smiles. The park we were passing by was a path filled with cherry blossom's pink shower. Our hands softly brushed against each other before intertwining. Our hearts filled with fresh promises. Our universe is elated. And I wondered if that's what beginning feels like.

I stood still, our raised voices still echoing in the room. Was that the sound of you closing the door behind me? Or was that the sound of my heart shattering? I knew you'd be back. Our universe was stubborn anyway. Perhaps we ached until we bloomed. And I wondered if that's what devastation feels like.

Do you ever think the universe has moved for us? You came home one night holding a rescued calico cat you found by the park we go to, asking if we could keep it. The little angel softly purring in content in your arms. Moonlight gently reflected on your face through the creaks of the window blinds. And I thought maybe it's the way of the universe. You can feel it even without words after all. And I wondered if that's what happiness feels like.

On days where I hated being me, my phone switched off and my vision blurred. Cocooning myself in blankets, my hands trembled and my thoughts clouded. It's a quarter to midnight and I felt you softly tap on my shoulder before engulfing in a tight hug. I realized you were my penicillin, gently saving me. And I wondered if that's what warmth feels like.

When I finally saw you from the other side of the aisle, maybe the universe was jealous of us. It took us six years. All my life I had been wondering, wondering what this feeling was deep within my chest. I wondered what it was. I wondered what this feeling meant. I wondered why it took me so long to realize. The answer had always been there.

It's you.

Waiting

Shazeed-Ul-Karim
Section Officer, OEFCD

Sitting at empty portico, like every cockcrow,
Sipping a cup of tea with ginger, smoky flow.
Looking up at the sky,
If you greet me saying, ‘Hi’
And embrace me through your aurora glow.
Standing forlornly by the wall beneath sun ray
Longing for your sunbath and you will say,
‘Forget all fash and fright,
I will be there right,
Together we will fight and travel all day’.
But desires deceived and turned to fake
And my yearn for her come-back.
Soothing morning to meridian,
Empty cup and the Sun,
All they laugh at and deride behind my back.

Couple of Good Lessons

Lt Col Alamgir Kabir, psc, EB
Additional Director (Budget), CFO office

1

A small boy was very selfish; He would always grab the best for himself. Slowly, everyone left him and he had no friends. He didn't think it was his fault so he criticized others.

His father gave him 3 sentences to help him in life.

One day, his father cooked 2 bowls of noodles and put on the table. One bowl had one egg on top and the other bowl did not have any egg on top. He said "My child. You choose. Which bowl do you want". Eggs were hard to come by those days! Of course the boy chose the bowl with the egg! As they started eating, he was congratulating himself on wise choice/decision and eat up the egg. Then to his surprise, as his father ate his noodles, there were TWO eggs at the bottom of his bowl beneath the noodles! The boy regretted his choice so much and scolded himself for being too hasty in decision. His father smiled and said, *"**My child. You must remember, what your eyes see may not be true. If you intent on taking advantage of people, you will end up losing**!"*

The next day, his father again cooked 2 bowls of noodles: one bowl with an egg on top and the other bowl with no egg on top. Again, he put the two bowls on the table and said, "My child, you choose. Which bowl do you want?" This time boy thought he was smarter. He chose the bowl without any egg on top. To his surprise, as he separated the noodles on top, there was not even a single egg at the bottom of the bowl! Again his father smiled and said, "***My child, you must not always rely on experiences because sometimes, life can cheat you or play tricks on you. But you must not get annoyed or be sad. Just treat this as learning a lesson . You cannot learn this from textbooks***".

The third day, father again cooked 2 bowls of noodles, again one bowl with an egg on top and the other bowl with no egg on top. He put the 2 bowls on the table and again asked, "My child. You choose. Which bowl do you want?". This time, boy told father, "Dad, you choose first. You are the

head of the family and contribute most to the family. ” Father did not decline and chose the bowl with one egg on top. As the boy ate his bowl of noodles, he was sure that there was no egg inside the bowl. To his surprise! There were TWO eggs at the bottom of the bowl.

Father smiled with love, ”***My child, you must remember that when you think for the good of others, good things will always naturally happen to you***!”

---Collected

2

One day, a ten-year-old boy went to an ice cream shop, sat at a table and asked the waitress, “How much is an ice-cream cone?” She said, “seventy-five cents.” The boy started counting the coins he had in his hand. Then he asked how much a small cup of ice-cream was. The waitress impatiently replied, “sixty-five cents.” The boy said, “I will have the small ice-cream cup.” He had his ice-cream, paid the bill and left. When the waitress came to pick up the empty plate, she was touched. Underneath were a ten one-cent coins as tip. The little boy had consideration for the waitress before he ordered his ice-cream. He showed sensitivity and caring. He thought of others before himself.

If we all thought like the little boy, we would have a great place to live. Show consideration, courtesy, and politeness. Thoughtfulness shows a caring attitude.

……..Collected

কমতি

নুসরাত জাহান
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
ব্যাচ-২০১৮

শ্মশান ঘাটে পাড়ার অনেকেই এসেছেন দেখা যাচ্ছে। চাটুজ্জেও এসেছে, অথচ কালকে হাট বারের দিনেও তাকে যাচ্ছে তাই বলে দিয়ে এসেছিলো বিমল। আর বলবেই বা না কেন? এক সের লবনের দাম ২ টাকা? মগের মুল্লুক নাকি? সে গরিব হতে পারে তাই বলে কোন জিনিস এর দাম কত তা জানবে না? মনে মনে চাটুজ্জেকে আরো কয়েক দফা বকে নিয়ে আবার তার দিকে তাকালো বিমল। চাটুজ্জে তার দিকেই আসছে। মনে হয় কালকের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইবে, ভেবেই ভালো লাগছিলো তার। চাটুজ্জে কাছে এসে কাধে হাত রেখে বললো "শক্ত হও বিমল, বৌদি বোধ হয় এইটুকুনি সময় নিয়েই এসচিলেন। ভগবান তার কল্যাণ করুক। ওমনি মাজার ব্যাতা নিয়ে টিকে তাকা তো মুকের কতা নয় বাপু।" বিমলের মনে পড়লো সে তার স্ত্রীর শবদাহ করতে এসেছে। কামিনী আর নেই। অথচ এই কথাটা তার মাথা থেকে সরে গেলো কি করে।

কামিনীর জন্মের পরে মা মরে, বাপ ধারের টাকা না দিতে পেড়ে গ্রাম ছাড়ে। আর মাসী বিয়ে দিয়ে আপদ বিদেয় করে। নয়তো কামিনীর মতন সুন্দরী তার ভাগ্যে থাকে? সুন্দরী হলে কি হবে, স্বভাব ভালো না কামিনীর। হাটবারে দিনে কেন তার মুরগীর ডিম আর শাক পাতা নিয়ে হাটে যেতে হবে? মেয়েছেলে আবার হাটে যায় নাকি? এইসব বলে বিমলকে প্রতিবেশীরা সে কি অপদস্তই না করলো। কামিনী কেন তাকে এইসব নিয়ে হাটে যেতে দেয় না? মানলো সে মাত্র পাঁচ ছয় বার ওই টাকা দিয়ে জুয়া খেলেছে, প্রতিদিন তো আর অমন করবে না। আবার বিমলকে এইসব নিয়ে কথাও শোনায় কামিনী। এতো বড় সাহস, বেহায়া মেয়েছেলে স্বামীর উপর কথা! গোপালটা বলেছিলো "বিমলদা শোন, মেয়েছেলেকে সব সুময় হাতের মদ্দি রাকতে অয়, নয়তো লোকে ছে ছে করবে কিনি দেকো।" ওই জন্যই পরদিন সকাল সকাল নিজেই সব নিয়ে হাটে চলে যায়। সব ঠিক ঠাকই হচ্ছিলো, কোথা থেকে মাধবটা এসে খুব করে ধরে বসলো যাত্রা দেখতে যেতে। কলকাতা থেকে নাকি লোক এসেছে। এই সুযোগ ছাড়া যায় না, যেতেই হবে।

পরদিন বাড়ি ফিরতেই কামিনী দৌড়ে এলো, "পয়সা কোতায়? বলি পয়সা কি করেচো, দু'বেলা খাওন ওই পয়সা তেই হয়। আবার জুয়া খেলে দিয়ে এসেচো তো? কাল থেকে না খেয়ে আচি, একন বলো দেকি কি খাওয়াবে?" সকাল সকাল এই চেচামেচি ভেবেই এক চড় বসিয়ে দিলো বিমল কামিনীর গালে। মেয়েমানুষ প্রশ্ন কেন করবে? পয়সা আজ আছে কাল নেই। জীবন আর কয়দিনের? সে ইচ্ছে মতন চলবে না তাই বলে? চড় খেয়েই কামিনী উঠে দাড়ালো, আরো জোরে প্রশ্ন করতে থাকলো। নাহ বিমলের ধৈর্য আর থাকলো না, কাছে এক মোটা ডাল পড়ে ছিলো রান্নার জন্য, তাই উঠিয়ে ইচ্ছে মতন পেটালো। পিসিমা এসে না ফেরালে হয়তো মেরেই ফেলতো বিমল। "মেয়েছেলে এতো তেজ কিসের? বেশি হের ফের কল্লে ছেড়ে দিয়ে আসপো তোর মাসীর কাচে, থাকিস ওকানে লাথি খেয়ে।"

বিমল ওতো বেশি জোরেও মারেনি; কিন্তু এ নিয়ে সে কি কাণ্ডটাই না করলো কামিনী। চারদিন তো ঘর থেকেই বেরুলো না। কোমরে নাকি ব্যাথা তার। ডালটার বারি সব কোমরেই পরেছে বেশি। পা ফুলে গেছে। কপাল

খানিকটা উঁচু। ভালোই হয়েছে, ভাবলো বিমল। বাড়ির কর্তার মুখের উপর কথার উচিৎ জবাব হয়েছে। এই কদিন সে নিজেই হাটে যাচ্ছে। অন্নপূর্ণাটা কি পাজি, হাট থেকে বাড়ি ফিরতেই দৌড়ে এসে বলে "পয়সা কোতায় বাবা? সদাই এনেচো তো?" বিমল ঠাস করে একটা চড় দিয়ে দেয়। এতো মাথায় উঠানো যাবে না এদের। তার বাড়ির উঠানে গাছ করেছে, তো ফসলের মালিক তো সে। কাওকে জবাবদিহি কেন করবে? এভাবে ৫/৬ দিন যাওয়ার পর বিমল আর সইতে না পেরে কামিনীকে টেনে বাইরে নিয়ে আসে। "বসে বসে খাওয়া? যা কাজ কর জমিদারের বেটি"। অন্ন পাশ থেকে লাফাতে থাকে,"মা জমিদারের বেটি, মা জমিদারের বেটি"। ইচ্ছে করে এক চড় দিয়ে দিক গালে। কামিনী দাওয়ার খুটি ধরে দাঁড়িয়ে সামনে আগানোর পর দু চার কদম যেয়ে উঠোনে পড়ে যায়। ধরা ধরি করে শুয়াতে শুয়াতেই মরে গেলো।

শব পোড়ানো শেষ। গজারি গাছটার দিকে চোখ পড়তেই সারা শরীর কেমন কাঁটা দিয়ে উঠলো তার, কামিনী যে দাঁড়িয়ে আছে। ভালো করে চেয়ে দেখলো নাহ। কেউ তো নেই, কামিনী কি মরার পরও তার উপর ক্ষোভ রাখবে? উপরে তাকালো সে। আকাশ অন্ধকার করেছে, বৃষ্টি পড়ার আগেই বাড়ি ফিরতে হবে।

অন্নর বিয়েতে এক জোড়া কানের দুল দেবে বলে কামিনী টাকা জমাচ্ছিলো। সে টাকা দিয়ে বিমলের কিছুদিন ভালোই কাটলো। বসে খেলে রাজার ধনও ফুরায়, ঐই কয়টা টাকায় খুব বেশিদিন কাটলো না। এর মধ্যেই গোপাল অলুক্ষুণেটা আরেক খবর দিয়ে গেলো। আফগান থেকে কোন মনিব এসেছেন। অনেক টাকার মালিক। জুয়া খেলা নাকি তার শখ, তার সাথে খেলে তাকে হারালে ৫শ' টাকা দেবে।

"৫শ' টাকা কি মুকের কতা? একুলে দেকেছো কোনদিন?" এইসব বলে বিমলকে আরো ক্ষেপিয়ে দিয়ে গেলো সে। কিন্তু শর্ত আছে, শ'তিনেক টাকা আগে জমা দিতে হবে। পরে হেরে গেলে টাকা ফেরোত দিয়ে দেবে। আর জিতে গেলে তিনশ এর সাথে আবার পাঁচশ! উফফ! খুশিতে বিমলের ঘুম উড়ে যায় অবস্থা! কিন্তু তার কাছে তো ৫ টাকাও নেই, শ'তিনেক টাকা কোথায় পাবে! রায়বাবুর কাছে গেলে টাকাটা পাওয়া যেতে পারে।

অন্নটা খুব জ্বালাচ্ছে কিছুদিন থেকে। কোথাথেকে যেন দেখে এসেছে লাল চুড়ি, এখন তা কিনে দিতেই হবে। না করলেই মা মা করে কান্না ধরে। ওকে সাথে নিয়েই হাটে রায়বাবুর গুদাম ঘরের দিকে যায়। হাট থেকে চুড়িও কিনে দেয়া যাবে।

"সাতে ওটা তোর মেয়ে নাকি রে? ভালোই তো বড় হয়েচে।" বললেন রায় বাবু।

"আজ্ঞে কত্তা আপনাদের আশীর্বাদে"

(অন্নপূর্ণার দিকে তাকিয়ে) "কেন এসেচিস?"

"কামিনীর পাড়ায় কিছু পাওনা ছিলো, তাই দিতে চেয়েচি। আমার কাচে এক কড়িও নেই। তাই ভিটেটা বন্ধকি করতে এসচিলুম শ'তিনেক টাকা দিলেই হতো"

"অ.. কত হলো বয়েস মেয়ের?"

"কতা... ন'বছর"

"বিয়ের তো বয়েস হয়েচেই, আমার সালাবাবুর কাচে দিয়ে দে। তোর মেয়ে রাজরানি হয়ে থাকপে কিনি দেকিস।"

"বাবু বয়েস যে মোটে ন' হলো, এতো কম বয়েসে কি করে দি"

"এই বয়েসেই তোর মা পিসিমারা সংসার করেচে। তোর মেয়ে কি রাজার মেয়ে, তোর সাধ্যি আচে? তোরা ছোট জাত। ওমনিও অতো ভালো ছেলে কোতায় পাবি?"

“কিন্তু আপনার শালাবাবুর যে বয়েশ ৬০ এর ঘরে!”

“ওটাই বয়েশ বিয়ের। তাছাড়া তুই কাঁচা পয়সা পাবি। এমন ৩/৪ টে বাড়ি এমনি দিতে পারবি। লাগলে আজই শ’পাঁচেক পাঠিয়ে দেই।

“৫’শ! আজ্ঞে মেয়ে সুকে থাকপে তো?”

“সে আর বলতে, তো এই মাসেই পণ্ডিত ঠিক করুক? যত আগে দিবি তত লাভ”

“আজ্ঞে ঠিক আচে, তাইলে আজকে ৫’শ টা..”

“এই নে, আরো পাবি।”

বিমল সুখেই আছে, মেয়ে নিয়ে আর চিন্তা নেই তার। গেলো মঙ্গলবার বিয়ে হয়েছে। অনেক টাকা পেয়েছে সে, মেয়ে হয়ে জন্মেছে বিয়ে তো দিতেই হতো। বিয়ে করে বাপকে মুক্তি দিয়ে গেছে তাই তো অনেক। বৃষ্টি পড়ছে, দাওয়ায় বসে হুক্কা টানছে বিমল। এই সুখ বোঝাবার নয়।

বিদেশে উচ্চশিক্ষা: স্বপ্ন যখন সত্যি হয়

ড. মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান
সহকারী অধ্যাপক
ডিজাস্টার অ্যান্ড হিউম্যান সিকিউরিটি ম্যানেজমেন্ট

আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছে বিদেশ বিভূঁইয়ের গল্প শুনতাম। যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডা, জাপান, থাইল্যান্ড আরও অনেক অনেক দেশের গল্প। উনারা স্কলারশিপ নিয়ে পড়তে গিয়েছিলেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে ওইসব দেশের আচার, ব্যবহার, খাবার সামনে থেকে দেখার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলেন। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম, স্যার অথবা ম্যাডাম কখন আমাদের একটু ওইসব দেশের গল্প বলবেন, আমরা স্বপ্নাতুর হয়ে শুনতাম। এই যেমন, কোন একদিন জনৈক শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সমুদ্র বিজ্ঞান নিয়ে পড়াতে গিয়ে জাপানের সমুদ্রনির্ভর স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস নিয়ে গল্প শুরু করলেন। জাপানিজরা হরেক রকম সামুদ্রিক খাবার খেয়ে থাকেন যা খুবই স্বাস্থ্যকর। যে খাবারগুলো আমরা অবজ্ঞা করে ফেলে দেই বা খাইনা (যেমন সামুদ্রিক উদ্ভিদ), তাই জাপানিজরা চমৎকারভাবে পরিবেশন করে, হরহামেশা মজা করে খায়, আর স্বাস্থ্যকরও বটে। আমরা উৎসুক হয়ে জিজ্ঞাসা করি "স্যার আপনি কি খেয়েছেন ওই খাবার? কেমন খেতে?" শ্রদ্ধেয় স্যারের এর চোখ মুখ দেখেই বুঝতে পারি স্যার স্বপ্নে বিভোর হয়ে গেছেন, রাগি স্যার এর কোমল কণ্ঠ শুনে বুঝতে আর বাকি থাকে না, স্যারের এর কেমন লেগেছে। আবার কোনো একদিন স্যার এসে বলছেন, জাপানিজরা অনেক ভাল, ওনার জাপানিজ প্রফেসর ওনাকে অনেক পছন্দ করতেন। তিনি চাইতেন ওনার ছাত্র ভাল কিছু করুক, ভাল গবেষণা হোক ওনার ছাত্রের। কোন একদিন অন্য একজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষক এসে থাইল্যান্ডের গল্প বললেন। থাইল্যান্ডের বিশ্বখ্যাত প্রতিষ্ঠানে উনি পড়েছেন, কিভাবে সুযোগ পেয়েছেন, কিভাবে পরীক্ষা হয়েছে সব কিছু। আমরা গোগ্রাসে গিলতাম। ঢেকুর তুলতাম আর ভাবতাম, আমরাও কি স্যার এর মত যেতে পারব? আমাদের স্বপ্ন বুনিয়ে দেয়া স্যার/ম্যাডামদের মত করে কি আমরাও ঘুরতে পারব জাপান, থ্যাইল্যান্ড, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ, কানাডা অথবা অন্য কোনো স্বপ্নের দেশে?

বিশ্ববিদ্যালয়ের চার বছরের গণ্ডি পেরিয়ে জীবনের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ সময় এসে পড়লাম যেন, এই দীর্ঘ সময়টা চোখের পলকে কিভাবে চলে গেল বুঝতে পারিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের সময়টাকে বলা হয় জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। পড়াশোনার পাশাপাশি অনেক অনেক কিছু শেখা হয়, অনেক অনেক স্মৃতি জমা হয়, যা পরবর্তীতে বারবার মনে প্রাণে দোলা দেয়, অনেককেই বলতে শোনা যায় "আহ! আবার যদি পেতাম সেই ক্যাম্পাস, বন্ধু-বান্ধব!" সেই সময়টা পার হতেই সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা শুরু হল। আর শুরু হল নানা মুনির নানা মত। কেউ বললেন এটা কর, কেউ বললেন না না, ওইটা কর। কিন্তু স্বপ্নতো আগেই বুনা হয়েছে, স্বপ্নের কারিগরদের কাছে বারবার যেতাম। স্বপ্নের কারিগরদের ভেতর অন্যতম ছিলেন আবার সদ্য বেলজিয়াম সরকারের স্কলারশিপ নিয়ে পড়া শেষ করে আসা বড় ভাই। কিভাবে কোথায় যাওয়া যায়, হাতে একটা পয়সা নেই, ফ্রিল্যান্সিং করে যা আয় করতাম, তাও বন্ধ। স্কলারশিপই একমাত্র উপায় বাইরে পড়তে যাওয়ার। স্বপ্ন পূরণ হওয়ার। ইংরেজি ভাষার উপর দখল থাকার পাশাপাশি সার্টিফিকেটও যোগাড় করতে হবে যে আমি ইংরেজিতে পড়তে পারব, কথা বলতে পারব। ইংরেজি ভাষা দখলের সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা দেয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলাম। সাথে স্নাতকোত্তর এ ভর্তি হয়ে গেলাম।

স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়ার কিছু দিন পরেই বিভিন্ন স্কলারশিপ এ আবেদনের খবর পেলাম। সব সার্টিফিকেট (এসএসসি, এইচএসসি, স্নাতক, গবেষণা অভিজ্ঞতা, গবেষণা পত্র ইত্যাদি) স্ক্যান করে কম্পিউটার এ একটা

ফোল্ডার করে রাখলাম। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অনলাইনে আবেদন করতে হয়। এতদিন ধরে অনেক অনেক কষ্ট করে এইগুলো অর্জন হয়েছে সৃষ্টিকর্তার দয়ায়। মোটিভেশন লেটার/স্টেইটমেন্ট অব পারপাস লেটার এর নমুনা যোগাড় করলাম বড় ভাই, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছ থেকে। রেফারেন্স/রিকমেন্ডশন লেটার এর নমুনাও যোগাড় হল। এর পর শুরু করলাম নিজের জন্য এবং যেসব জায়গায় আবেদন করব বলে ঠিক করেছি তাদের চাহিদা অনুযায়ী মোটিভেশন লেটার লেখা। লেখার পর দেখে দেয়ার জন্য অনুরোধ করতাম যারা আগে পেয়েছেন তাঁদেরকে। তখনও ইংরেজি ভাষা দখলের সার্টিফিকেটের জন্য পরীক্ষা দেয়া হয়নি। কিন্তু আবেদনের সময়ও পেরিয়ে যাচ্ছে। ইউরোপিয়ান কমিশনের ইরাসমাস মুন্ডুস স্কলারশিপ এর জন্য সবাই চেষ্টা করছে। আমিও চেষ্টা করতে চাই, সদ্য স্নাতক পাশ করা একজন স্বপ্নাতুর ছাত্র। ভয় হতে থাকলো, আমাকে কেন নিবেন তাঁরা? আমার এখনও ইংরেজি ভাষা দখলের সার্টিফিকেট যোগাড় হয় নাই, কোনো চাকরীর অভিজ্ঞতাই নেই, কোনো জায়গায় চাকরীও করছি না। এরমধ্যে শুনলাম যারা শিক্ষক এবং গবেষক, তাঁরাই নাকি অগ্রাধিকার পান সাধারণত। আরও মুষড়ে পড়লাম। নিউজিল্যান্ডে পড়তে থাকা এক বড় ভাই ছিলেন, অনেক বড় ভাইয়ের মত তিনিও সব সময় উৎসাহ দিতেন। তিনি বললেন, "যুদ্ধে নামার আগে কখনই হেরে যেও না, তোমার কাছে যা আছে, যুদ্ধের সময় হলে তাই নিয়েই নেমে পড়, কে জানে তুমিই হয়ত বিজয়ী হবে!"

আমি যুদ্ধে নেমে পড়লাম, আবেদন করা শুরু করলাম যা যোগ্যতা আছে তাই দিয়েই, ইরাসমাস মুন্ডুসে একজন আবেদনকারী সর্বোচ্চ তিনটি বিষয়ে আবেদন করতে পারে। আমিও করলাম। প্রতিটা বিষয়েই ইংরেজি ভাষা দখলের সার্টিফিকেটের দরকার ছিল। কিন্তু কোনো আবেদনকারী যদি চার বছর ইংরেজিতে পড়েছেন এমন কোন সার্টিফিকেট দেখাতে পারেন, তাহলে তাকেও বিবেচনা করা যেতে পারে। "মিডিয়াম অব ইন্সট্রাকশন" সার্টিফিকেট যোগাড় করলাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। দুরু দুরু বুকে অপেক্ষা করতে থাকলাম। এক জায়গা থেকে অনলাইন এ পরীক্ষার জন্য ডাকা হল।

কোন এক প্রভাতে আম্মা নাস্তা যোগাড় করছেন, সবাই প্রস্তুতি নিচ্ছেন অফিসে যাওয়ার। কি মনে করে নিজের ইমেইল টা খুললাম, "ডিয়ার রাহমান, উই আর প্লিসড টু ইনফরম ইউ..." কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। দুই ধরনের ইমেইল করে সাধারনত "স্কলারশিপ সহ, অথবা স্কলারশিপ বাদে, কিন্তু নিজ খরচে পড়তে হবে"। আমার ইমেইলটা ছিল ওরা আমাকে স্কলারশিপও দিবে! সদ্য স্নাতক পাশ করা এক ছাত্রকে পড়তে ডাকছেন দি নেদারল্যান্ডসে, এরপর সুইডেনের শিক্ষার শহর উপ্সালাতে! লাফ দিয়ে উঠালাম, চিৎকার দিলাম, দৌড়ে আসলেন আম্মা, জড়িয়ে ধরলাম। খবর পেয়ে সবাই উচ্ছ্বসিত! ছেলের স্বপ্ন সত্যিই হতে যাচ্ছে তাহলে, আব্বা আম্মা একটু ভয়ও পেলেন। এতো টুকুন ছেলে তাঁদের! সে যাবে ইউরোপে পড়তে! এর পর আরও একটা ইরাসমাস মুন্ডুস এ ডাক পেলাম এবং এটাও স্কলারশিপসহ। মধুর সমস্যায় পড়লাম, কোনটায় যাব।

দি নেদারল্যান্ডসের ওয়াখানিখেন শহরে যাচ্ছি, সাথে বিশাল দুইটা লাগেজ, কাঁধেরটাও কম নয়! সব বাসা থেকে দিয়েছে, এই শহরে মনে হয় আমার কিছুই কেনা লাগবে না! ট্রেন দুর্বার গতিতে ছুটছে, কি চমৎকার ট্রেন এদের! আশে পাশে অনেক যাত্রী, কেউ কোন ভ্রুক্ষেপ করছে না, যে যার মত আছে। আমি বাইরে তাকিয়ে দেখছি, কি সুন্দর এই দেশ! প্লেনে উড়াল দেয়ার আগে যে কষ্ট ছিলো, সবাইকে ছেড়ে বিদেশ বিভূঁইয়ে পাড়ি দিতে যাচ্ছি, সেই মানসিক বেদনা অনেকখানি কমে গেছে। ফুটবল খেলার ভক্ত ছিলাম, আমাদের সময় ছিল ডেনিস বারক্যাম্প, অল ফুটবল খেলতো ডাচরা। মনে পড়ে গেল, সেই প্রিয় খেলোয়াড়দের দেশে আমি এখন পড়তে এসেছি, সাথে ওদের পাঠানো এটিএম কার্ড, কড়কড়া ইউরোও আছে পকেটে।

বাস স্ট্যান্ড এ দাঁড়িয়ে আছি, ঝা চকচকে এক বাস এসে দাঁড়াল, বিশালদেহী ড্রাইভার বাস থেকে নেমেই চমৎকার ইংরেজিতে "হে, ওয়েলকাম টু ওয়াখানিখেন! ক্যান আই হেলপ ইউ!"

বিদায়

মো: আরিফ হোসেন
ডিপার্টমেন্ট অব পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন
ব্যাচ-২০১৮

জীবন প্রদীপ নিভিয়া আসিছে
দেখিতেছি কার ছায়া,
কেমন করিয়া কাটাইব আমি
এই জগতের মায়া!

আসিয়াছে ঘাটে পারের তরণী
পার করিবে মোরে,
এতদিন মোর কাটিয়াছে কি যে
অদ্ভুদ এক ঘোরে।

যাইবার কালে যখন দেখিনু
ক্ষণিক ফিরিয়া পিছে,
যাহা লয়ে ছিনু, যাহা চেয়েছিনু
সকলই কেবলই মিছে।

শুনাইতে মোর বিদায় গীতি
আসে নাই আজ কেহ,
ভাবিলাম হায় কার তরে আমি
সঁপেছিনু এই দেহ!

পরম আলোয় নয়ন মম
পুলোকিত হইয়া আসে,
নিয়তি আমার মুখ পানে চেয়ে
মিটমিটিয়ে হাসে।

The Melancholic Mother-Earth!

Mahbub Alam
Lecturer, Dept. of Environmental Science

Can you draw the sky? Blue sky!
The sky where the sun is lost
The moon is peeped
Fill with white n flabby clouds, as soft as my heart
Can you draw the dew?
The dew hoards on the paddy fields
The dew moist me n clutches my attention
Can you draw the rain? Heavy rain!
The rain falls without stumbling on my roof
Make jingle sounds, dances like heart-wrenching
The rain makes my mind spellbound
That looks at life anew by a coffee-round
Can you draw the sunshine?
The conciliate sunshine
That burns me a little n kisses me to blush
Can you draw the plants?
The burgeoning verdant plants
Those give me shadow n make me ease
Those donate me oxygen - the treasure of life
Can you draw the birds?
The halcyons or colorful chirping birds
Their lurid gesture dwindle my drabness
Their dulcet chirps make me euphoric
: No
: I can’t draw anything, how can I draw?
: Cruelty of human makes me cry
: Your atrocity makes me wounded
: You snatch my verdant n blacken me by smokes
: You debase me with polymers and conflagrate me with oxides.
: I cherish to draw again!
: I want to draw again the blue sky with flamboyant clouds and euphonious birds.
: I want to draw again the sublime sunshine with glazing dew.
: I want to draw again the human comfort with environmental serenity.
: Will you let me look for opportunities again?
: Will you let my hope shine?
: Will you let me be your tender mother-earth?

সময়ের পথে

সাইমা আফসারা
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাচ-২০১৯

নদী তেমনি বহে, সময়ের বহতায়
যেমনটি স্রোত চলে অপেক্ষাহীন গতিময়তায়
নদী, তোমাকে সঙ্গী করে আমি
চললাম অজানার পথে,
আমাকে বলে দিও তুমি
যেতে যেতে গন্তব্যের রথে,
কখন থমকে দাঁড়াতে হবে
কখন চমকে পেছনে তাকাতে হবে,
তাকিয়ে দেখবো সবাইকে ফেলে
অনেকটা একা, একাই
চলে এসেছি অনেক সামনে
মনে হয় জীবনের অনেক পবিত্র সুন্দরতম ক্ষণে
নিজেকে হারিয়ে ফেলেছি অযতনে,
সবাই যখন নির্লিপ্ত খেলায়
আমি তখন মেতেছি গন্তব্যের পথে চলায়,
এখনও চলছি
জানি না কবে শেষ হবে
এই পথ চলার।

আবদ্ধ জীবন

মোঃ আবু বকর
আইন বিভাগ, ব্যাচ-২০১৮

কফির কাপে তৃতীয় বার চুমুক দিয়ে কাপটা আবার টেবিলে রেখে দিলাম। অনেক সময় ধরে খাওয়ার জন্য বেশ খানিকটা ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছে। শরীর সতেজ করার জন্য তেমন একটা কার্যকরী না হলেও ঠাণ্ডা করে কফি খেতে আমার দারুণ লাগে। বা পাশে জানালার দিকে বসলে বিশালাকার সাগরটা দেখা যায়। এখান থেকে সামনের পুরো দৃশ্যটাই আমার কাছে খুব মনোমুগ্ধকর লাগে। কথাটা শুনে হাস্যকর লাগতে পারে এই ভেবে যে, মেরিনারের কিনা সাগর দেখতেই ভাল লাগে! জীবন তো এ দেখেই পার হচ্ছে।

হ্যাঁ, কথা সত্যি। কিন্তু সব দেশের সব পোর্ট তো আর এক রকম হয় না। কিছু পার্থক্য থাকেই। বৈরুতে সাগরের দৃশ্যটা না হয় এখান থেকেই আমার ভাল লাগল। লেবাননে আগে একবার এসেছিলাম ক্যাডেট অবস্থায়। ক্যাডেটশিপ শেষ হওয়ার পর এবারই প্রথম। হাতে এবার সময়-সুযোগ আছে। কিন্তু গতবারের মতন শহর ঘুরে দেখার ইচ্ছাটা এবার নেই। শিপের বাকি প্রায় সবাই যেয়ে বসেছে রাস্তার ওপাশের বারে। প্রায় জোর করেই এক ক্যাডেটকে আমার সাথে নিয়ে এসেছিলাম। কিন্তু ওর উড়ুউড়ু ভাব দেখে খুব ভালো করেই বোঝা যাচ্ছে ওর মন এখানে নেই। বাইরে যাওয়ার প্রস্তাব দিতেই, এক ছুটে বেরিয়ে গেল। এবার আমি একা। কাপে আরও একবার চুমুক দিয়ে চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিলাম।

দূরে জেটির পশ্চিম দিকে আমাদের শিপটা দেখা যাচ্ছে। দুদিন হল বৈরুতে আমাদের শিপ নোঙর করেছে। আগামীকাল নাগাদ হয়ত সব মাল খালাশ করে বেরিয়ে যেতে পারব। বছর পাঁচেক আগে যখন শেষবার এসেছিলাম তার চেয়ে এখন শহরের এ পাশটা অনেকখানি পরিবর্তন হয়েছে। লেবানিজদের মধ্যে খ্রিষ্টান মেজোরিটি অন্য আরবদেশ গুলোর চেয়ে বেশি। আর এ ব্যাপারটা এখানের স্টান লোকজনের ভেতর খুব ভাল করেই পরিলক্ষিত হয়। এরা এদের প্রতিবেশী দেশগুলোর মতন অতটা কঞ্জারভেটিভ নয়। এদের সাথে বেশ সহজেই মেশা যায় আর এরা খুব আমুদেও।

মাসের পর মাস সাগরে থেকে যখন কোন পোর্টে নামার সুযোগ হয়, জীবন উপভোগের নানা রকম পরিকল্পনা মাথায় ঘুরতে থাকে। মনের খায়েশ পূর্ণ করে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করাটাই যেন জীবন। আর এমন একটা জীবনই তো আকাঙ্ক্ষিত ছিল আমার। কলেজ ছাত্র থাকাকালীন প্রায় সব বন্ধুরাই বুয়েট, মেডিকেল কিংবা বড় বড় ভার্সিটি নিয়ে স্বপ্ন দেখত। এক আমি কোনভাবেই নিজেকে ওসবে মানিয়ে নিতে পারতাম না। স্কুল জীবন থেকেই ঘুরে বেড়ানোটা আমার নেশা। আর এটিকেই কি করে পেশা বানানো যায় তাই ছিল আমার একমাত্র চিন্তা। টুরিস্ট গাইড, ফটোগ্রাফার, স্পোর্টস জার্নালিস্ট এমনই আরও কত রকম চিন্তা করে কাটাতাম। বিভিন্ন পেশা নিয়ে সেসময় ঘাটতাম শুধু এটা বের করার জন্য কি করে, কত সহজে দেশ বিদেশ ঘুরে বেড়ানো যায়। আর সব কটিতেই মনে হয়েছিল বড় বেশি খাটনি রয়েছে। তাই শেষ পর্যন্ত এই পেশা বেছে নেয়া। চাকরীর সুবাদে ঘুরে বেড়ানো হবে সাথে প্রেস্টিজিয়াস স্যালারি। আর কি চাই! নিজেকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ডিতে না বেঁধে মুক্ত করে দেয়াতেই যেন সব সুখ বিদ্যমান।

তবে সব সময় যে এমন সুখ লেগেই থাকে তা না। মাঝে মধ্যে দেশের কথা, পরিবারের কথা মনে পড়ে। সুযোগ থাকলে কথা হয়, না থাকলে হয় না। কখনও কখনও নিজেকে ভীষণ একাকী মনে হয়। কোনো কোনো পোর্টে নেমে কখনও অনেক মানুষের ভীরে নিজেকে হারিয়ে ফেলি। চারপাশে অনেক মানুষ থাকার পরেও যেখানে পরিচিত কোন মুখ থাকে না, কারো সাথে কথা বলার মত কেউ থাকে না তখন নিজেকে ভীষণ অসহায় মনে হয়। আর সেজন্য যেসব দেশে মানুষের সাথে সহজে মেশা যায় এগুলোতে বারবার ফিরে আসতে ইচ্ছে করে।

কখনও বা মনে অদ্ভুত রকমের খেয়াল জন্মে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম একটা এমন যে, শ্বশুর বাড়িটা বিদেশ বিভুয়ে হলে হয়ত মন্দ হয় না। এমন আবদারের কথা বাড়িতে যেয়ে বলতে পারার সাহস হবে কিনা তা ঠিক জানি না; আর বললেও প্রতিক্রিয়ায় কি এক তুলকালাম কাণ্ড ঘটবে তাও কিছুটা অনুমেয়। কিন্তু সব রকম চিন্তা বাদ দিয়ে সাধারণভাবে দেখলে এ যে খুব একটা দুঃসাধ্য কাজ তাও না। কদিন দুটা বাঁকা কথা শুনতে হতে পারে তারপর তো আর কিছু হওয়ার দেখি না। সমুদ্র অভিযানে বেড়িয়ে যদি সময় সুযোগ হয় তো এদিকেও ঘুরে যাওয়া যাবে। দেশের বাইরে এমন এক ঠিকানা হওয়াটাও বা খারাপ কি?

আমার ফ্যান্টাসি তো চমৎকার! এমনসব আকাশকুসুম চিন্তার জন্য নিজেকে মাঝে মধ্যে বাহবা দিতে ইচ্ছে করে।

তবে এ যাবতীয় চিন্তার কেন্দ্রে আছে একজন। মনের মানুষ, প্রাণের নারী এমন বলার সময় আসে নি; তবে ভালই লাগে। সেবার যখন ক্যাসাব্লাঙ্কায় গিয়েছিলাম তখন ওর সাথে পরিচয়। কলেজ ছাত্রী, মেডিসিনে থার্ড ইয়ারে পড়ে। ঠিক কিভাবে পরিচয় হয়েছিল তা কেন যেন মনে নেই। কলেজের কয়েকজনের একটা গ্রুপে ওকে প্রথম দেখা। হাসান (ষষ্ঠ) মসজিদটার বাইরে, আটলান্টিকের পাড়ে অনেকক্ষণ কথা বলেছিলাম। কি এত কথা হয়েছিল তার কিছুই আজ মনে পরে না। কিন্তু সে থেকেই শুরু। তারপর থেকে প্রায় নিয়মিতই যোগাযোগ হয়। পরে অবশ্য আরও একবার দেখা করেছিলাম ওর নিজের শহর আগাদিরে। আগাদিরেও যে পোর্ট আছে তা আমি জানতাম না। ওখানে পোর্টের গভীরতা কম হওয়ায় মাদার ভেসেলগুলো যায় না। একারণে আমার কখনও যাওয়া হয় নি। আর এ বিষয়েও জানা ছিল না।

এতদিনের পরিচয় আর কথাবার্তায় আমার তো ওকে খুবই ভাল লাগে। আবার ওর দিক থেকেও হ্যাঁ সূচক ইঙ্গিত আছে বলেই মনে হয়। কিন্তু এখন পর্যন্ত সরাসরি জিজ্ঞেস করার সাহসও হয়ে ওঠেনি। আবার এমন একটা কথা বলে কি পরিস্থিতির স্বীকার হতে হয় তাও ভেবে চিন্তা হয়। তবে যাই হোক এবার দেখা করে সামনাসামনি জিজ্ঞেস করব। আশা করি মন ভাঙবে না।

জানালার উত্তর দিকে দেখলাম বশ বড় একটা ধোঁয়ার কুন্ডলী অনেক উপরে উঠে গেছে। রাস্তায় মানুষজনের ভালই শোরগোল শোনা যাচ্ছে। ঘটনা কি দেখার জন্য ক্যাফে থেকে দ্রুত বেড়িয়ে ঘটনাস্থলের দিকে এগোলাম। কাছেই চারটা লেন পরে একটা কারখানায় আগুন লেগেছে। ঠিক কি কারণে আগুনের সৃষ্টি তা বোঝা যাচ্ছে না। মানুষ খুব একটা কাছেও যাচ্ছে না। পকেট থেকে ফোনটা বের করে চিন্তা করলাম একবার রেকর্ড করি। ঠিক তখনই বুমমম..... । বিকট আওয়াজে ওদিকেই কি যেন বিস্ফোরণ হল। প্রথমে একবার তারপর টানা কয়েকবার। চারপাশে মানুষজনের চিৎকার আর ছোটাছুটিতে কিছুই ভাল করে বোঝা যাচ্ছে না। তার উপর আবার ধোঁয়ায় আমার অন্ধ হয়ে যাওয়ার অবস্থা। একটা দিক অনুমান করে এগোতে যাব, তখনই ভারী একটা লোহার চাকতি কপালে এসে লাগল। ব্যাথা সহ্য করতে না পেরে রাস্তার পাশেই বসে পরলাম। মাথাটা এমন ঝিম ধরে উঠল যে বুঝলাম জ্ঞান হারাচ্ছি।

"এই ওঠো। কোর্ট রুমে এভাবে কেউ ঘুমায়?" মাথায় বেশ জোরে দুটা টোকা মেরে এ কথা বললেন আমার সিনিয়র।

তড়াক হয়ে সোজা হয়ে বসে বললাম, "না স্যার! কই? ঘুমাচ্ছি না তো"

"হ্যা, তোমার মুখ দেখেই বেশ বোঝা যাচ্ছে কি করছিলে! চোখ তো লাল হয়ে আছে, সামনের বেঞ্চে মাথা রেখে ঘুমিয়ে কপালেও দাগ করে ফেলেছ। হেয়ারিং একটু দেড়িতে হবে বলে, বলেছিলাম একটু অপেক্ষা করো। তাই বলে কোর্টরুমে এভাবে ঘুমায় মানুষ? ঠিক সময়ে আমি না আসলে তো আজকে ঘুমিয়েই পার করে দিতে।"

"সরি স্যার"

"যাও, দ্রুত ফ্রেস হয়ে আসো। কিছুটা সময় এখনও বাকি আছে আমাদের কেসটা ওঠার।"

"আচ্ছা স্যার," বলে বেড়িয়ে এলাম। বাইরে এসে বুঝলাম কিছুক্ষণ আগের ঘোর মাথা থেকে এখনও পুরোপুরি কাটেনি। মুক্ত জীবনে সুখ খুঁজতে যেয়ে বিপদের চেয়ে, আবদ্ধ জীবনে ঝামেলাহীনভাবে সৃষ্টিকর্তা যে বাঁচিয়ে রেখেছেন; সেজন্য তাঁকে ধন্যবাদ জানিয়ে সামনে এগোলাম।

Confined

Sumaiya Tarannum Sujana
Dept. of Finance & Banking, Batch: 2018

Confined, within the four walls,
All their dreams,
Unknowingly, all their minds,
Started to scream.
When will they set free?
When will they fly?
Again in this world's charm,
When will they dive?
When will they hold again
Their loved ones' hands?
When again they will hop
In their beloved, cherished land?
Clouds of invisible hollows
Came upon the ground,
Grasped so many breaths
And hunted like a hound.

Time stood still, life stood still,
But hope didn't stand still;
Crawling under this terror
A new ray will come.
Flowers will bloom again
And moonlight will prevail,
World will be soothing again
And smiles will be vibrant.
Thousands of eyes glitter with hope
Of coming out of the cage,
Soon we will stand again
With crossing all our hands.

দেশ মাতৃকা

আব্দুল্লাহ আর রাকিব
ডিপার্টমেন্ট অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ
ব্যাচ-২০১৮

তুমি সমাজের বদল দেখো,
আর আমি তোমাতে আমার সমাজ দেখি।
তোমার কাছে সমাজের ভাঙ্গনের ঝড়,
আর আমার কাছে তোমার কথার স্ফুলিঙ্গের স্বর।
তোমার ভাবনায় দলিতের অধিকার,
আর আমার ভাবনায় তোমাতে গড়ে ওঠা আমার ঘর।
তোমার চোখে পুঁজিবাদীদের প্রতি বিষাদ,
আর আমার কাছে ধরা পরে তোমার চোখের নীচে কালচে দাগ।
তোমার মানসপটে নিয়মের বেহাল দশা,
আর আমার এখানে তোমার অগোছালো বদন খানা।
তোমার কাছে খর্ব হওয়া স্বাধীনতা,
আর আমার কাছে আমার আমিত্বের বিসর্জনতা।
তোমার চিন্তায় বদলের চিত্র আঁকা,
আর আমার চোখে তোমার বয়সের ছাপের রেখা।
তোমার কাছে মনে হওয়া ঘুনে ধরা চারপাশ,
আর আমার কাছে তোমার চুলের রঙে খাওয়া পাক।
নতুন দিনের লাল সূর্য তোমার স্বপ্নে,
আর আমার চোখ আটকে যাওয়া তোমার টকটকে লাল টিপে।
তোমার কাছে দেশ সর্বস্ব,
আর আমার কাছে, আমার কাছে তুমিই সর্বস্ব!

Stranger

Shadman Araf
Dept. of Administration in Management Studies
Batch: 2018

Hi, I'm Rahul Chowdhury. A 22 years old engineering student of a well-known university in Dhaka, Bangladesh. I live in a huge house of an up-scale neighborhood of the city with my family. My dad, Anwar Chowdhury does business related with some sort of international trade that's why he's always on the move. My mom, Reetu Chowdhury is self-employed but I am not sure about her business. But one thing to be mentioned, she's not any less busy than my dad. Actually, I was never really bothered about my parents' work. I belong to a typical upper class family and was never really close with my parents.

I consider myself a shy, introvert person. I've always been on my own, without any group of friends. Apart from attending my classes I don't get out from my home usually. My nights are normally spent sleepless, doing programming on my PC or by playing video games because I have insomnia. One night, I was in an intense level of a video game, suddenly my phone rang. It was from an unknown number so I ignored and continued playing the game again. But the person from the other side kept calling me. I kind of freaked out because I rarely get calls on my phone, but at midnight that is even more odd. At some point, I received the call and I heard the coldest voice of my life.

"Hello, Rahul. Still awake?" the stranger from the other side asked. I replied, "Who is this?". "You wouldn't know me, but I know you very well." stranger said. "This must be a prank. Are you someone from my class? Look, this is not funny." I replied. "You don't believe me, do you? Do what I say. See the photos from your old family photo albums, now." the call ended. I took albums on my bed and started looking at the photos sorted by years starting from Sylhet, Cox's Bazar and also Kuakata trip albums. All the pictures taken mostly in outdoors have one thing in common, that is, a suspicious tall looking man in the distant background. I couldn't believe my eyes. Why didn't I notice this in all these years. "Did I have a stalker following me all my life? Did my dad's wealth made me a target to the kidnappers? Should I inform this to my parents?" These were the questions kept following on my head. Finally after about an hour my phone rang and I received instantly.

"Hello Rahul. Seems like you were expecting my call." stranger said. "Tell me who you are and what do you want?" I asked. "Even if I tell you the truth you wouldn't believe me", stranger replied.

"Oh well, tell me." I replied. "I am your biological father. When you were born I could barely run the whole family on my own with four other children. So I had to give you for adoption to an impotent married couple for some money. That is where I made the mistake." stranger replied. I was in lost for words. For a moment I though the world around me had stopped. After a moment of silence I said, "So all these years you've been following me without revealing your identity, so what made you to do this now?", I replied with disbelief. "Because I want to save you, my son", stranger replied. "Save me? From what?" I asked laughingly. "Son, do you know what actually your father does? Or your mother? What you know is what they want you to know. Your father, Anwar, is the leader of a deadly mafia group. Your mother Reetu, is the daughter of the biggest drug dealer of the country. Your grandpa died when you were an infant so you don't know much about him. After his death, the whole drug cartel's responsibility was inherited your mother. But they're becoming old and soon they will retire. Who do you think they'll nominate to look after their mafia group and the drug cartel? It will be you, obviously. Your father is recently bringing his "colleagues" in your home to introduce with you, isn't he? What does that signify? Ever wondered what's in your house's basement where your mom never allowed you to go? Son, I want to save you. Run wherever you can stay safe, as soon as possible."

"Rahul, wake up! It's 2pm already. You have a guest waiting for you." I woke up suddenly hearing my mom shouting behind the door. My heart is beating fast and I'm sweating excessively. So all of these were just a nightmare? Well, it better be. Still, my inner self was telling me to have a look at the family photo albums again. I couldn't believe my eyes. It's him! It's him in the background of most of the photos. "Rahul, freshen up and go downstairs to meet the guest" my mom said again behind the door. I quickly got freshened up but mentally I was in a shock. Went downstairs and saw my dad with a man. "Rahul, meet Mr. Ratan. He is a colleague of mine and wants to discuss about our business with you." my dad said. I couldn't believe my ears. First the stranger in the photos, then this. That couldn't be a dream. I need to get out far away from her, ASAP. I made an excuse and left the meeting after couple of minutes, rushed to my room and started packing my necessary stuff, gadgets, passport and cash. I checked my phone and found out getting no calls last night. I held my phone and kept waiting for the stranger's call. While fleeing from my home, my inner self is screaming "Please stranger, call me. Tell me what to do now…."

অন্তরণ

মালিহা ইসলাম মনামি
ইংরেজি বিভাগ, ব্যাচ-২০১৭

কেমন আছে...?
শেষ বিকেলে রাস্তার মোড়ে এক কাপ চা,
দিনের শুরুতে জল না পাওয়া গাছের চারা?
কেমন আছে...?
বারান্দাতে শুকোতে দেওয়া আমের আচার,
হুট করেই স্তব্ধ হওয়া বসন্ত আর কোকিলের গান?
কেমন আছে...?
বুক পকেটে ভুলে যাওয়া এক নতুন কলম,
এই বর্ষার প্রথম দিনের গুচ্ছ গুচ্ছ না-ছোয়া কদম?
কেমন আছে...?
মরচেপড়া ডাকবাক্সে ঠিকানাহীন শেষ চিঠিটা,
পাখির ডানায় ভর করে নামা ঘরমুখো সব সন্ধ্যেবেলা?
আবার একদিন ফেরা হবে ছেড়ে আসা শহরটাতে;
মুখরতায় থামবে সেদিন নীরবতা এক নিমেষে।
অলিতে-গলিতে জীবন নিজেই জানান দিবে কেমন আছে-
পাওয়া না-পাওয়ার হিসেব-নিকেশ শুরু হবে নতুন ছকে।

টিটু

মোসাঃ সানজিদা ইসলাম পৃথিবী
পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ, ব্যাচ-২০১৯

বাসটা আমাকে ফুলতলা বাসস্টপ এ নামিয়ে হর্ন বাজিয়ে শা করে চলে গেলো। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি রাত ১০.৪৫ মিনিট। গ্রামাঞ্চলে এই সময় মানে গভীর রাত। ভ্যানগাড়ি পাবো না এই সময়ে জানতাম। বিকেল বেলা রওনা দিলে পৌঁছাতে এমন রাত হয়। তবুও ইচ্ছা করেই বিকেল বেলা রওনা দিয়েছি। পড়াশোনা, পরীক্ষার চাপে প্রায় ৬ মাস বাড়ি ফেরা হয়নি। তাই আজ পরীক্ষাটা শেষ করেই ব্যাগ গুছিয়ে সোজা বাড়ির পথ ধরেছি। টানা ৫ ঘণ্টা বাস জার্নি শেষে গ্রামের মাথায় বাসস্টপটাতে এসে নেমেছি। অন্ধকারে চিরচেনা বাসস্টপটাকেও অচেনা মনে হচ্ছে। চাঁদের আলোয় দেখলাম রং চটা হলুদ বোর্ডের কালো কালিতে লিখা "ফুলতালা যাত্রীছাউনি"। পাশে কোথায় যেন ঝিঁঝিঁ পোকারা একতালে ডেকে যাচ্ছে। জোনাকী পোকার দল ঝিকিমিকি আলো ছড়াচ্ছে চারপাশটায়। ঝোপের মাঝে থেকে চাঁপার গন্ধ বলে দিচ্ছে আমি আমার গ্রামে এসে গেছি। খেয়াল করলাম শীতটা একটু বেশিই লাগছে। ব্লেজারের রানারটা গলা পর্যন্ত টেনে ব্যাগটা কাঁধে নিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। এখান থেকে আরও ৩ কিলোমিটার হাঁটলে তবেই আমার বাড়ি।

কিছুদূর হাঁটার পর খেয়াল করলাম একটা আলো খুব দ্রুত এগিয়ে আসছে আমার দিকে। কিছুটা দমে গেলাম। কারণ এতো রাতে গ্রামের পথ ধরে কেউই আসে না। তাও আবার এতো দ্রুত!! ধীরে ধীরে আলোটা আমার দিকে এগিয়ে আসছে। আমিও একপা একপা করে পিছিয়ে যাচ্ছি ভয়ে। হঠাৎ কেউ যেন আমার নাম ধরে ডাক দিলো। "ইমু ল্যা" "?" গলাটা বেশ পরিচিত মনে হলো। আলোটা কাছে এগিয়ে আসতেই দেখি টিটু।

আমার ছেলে বেলার বন্ধু। সাইকেলে চেপে হাতে টর্চ নিয়ে এগিয়ে আসছে। আর ওর টর্চের আলো দেখে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। মনে মনে নিজের বোকামির জন্য হাসলাম। কিন্তু এতো রাতে টিটুকে দেখে অবাক হলাম বটে। জিজ্ঞাসা করলাম, "তুই?"। এতো রাতে কোথায় যাস??

"কোতি আবার? তুই আসপি শুনেই তো চাচা আমাক বুল্লো তুক বাসস্টপ থ্যাকি লি য্যাতে"

"আব্বা তোক পাঠাইছে?"

"তে আবার কেডা? চাচি চিন্তা করছিলো তুই এতো র‍্যাতে তো আবার ভ্যান পাবুনি। তাই আমাক সাইকেল লি চাচা পাঠ্যা দিলো।"

"ভালোই হলো। এতোখানি রাস্তা আসার পর আর শরীরটা চলছে না রে"।

"উঠেক তো সাইকেলে উঠেক"।

আমিও আর কথা না বাড়িয়ে টিটুর সাইকেলের পিছনে উঠে পড়লাম। ওর সাথে অনেক দিনের জমানো গল্প করা বাকি। জিজ্ঞেস করলাম, "বাসার সবাই ভালো আছে তোর?"

"হ! সগলাই ভালোই আছে।"

"ছোট বোনটা কোন ক্লাসে এবার?"

"কিলাস টেনে, বইনডা দেখতে শুনতে মাশাল্লাহ্। মাতবরের পোলার লগে বিয়ার কথা কইছিল। মুই বিয়া দিই নি। দিমু না, নিজে একবার লেহাপড়া করবার পারি নাই, বইনডারে পড়ামু।"

"হ্যাঁ, একদম ঠিক। আর মেয়েদের আগে নিজের পায়ে দাঁড়ানো দরকার।"

এইসব গল্প করতে করতে কখন যে বটগাছতলায় এসে পড়েছি খেয়ালই করিনি।

বটগাছটা বেশ পুরোনো।

রাতে তো দূরে থাক দিনের বেলাতেও বিশেষ দরকার ছাড়া কেউ এদিকে পা মাড়ায় না।

মুক্তিযুদ্ধের সময় নাকি গ্রামের মুক্তিযোদ্ধাদের পাক বাহিনী এই গাছের সাথে সবার সামনে ফাঁসি দিয়ে মারত। সেই থেকে নাকি গ্রামের অনেকেই রাতের বেলা এইদিক দিয়ে গেলে চিৎকার শুনতে পায়। তবে আমি এইসব বিশ্বাস করি না। আত্মা বলে কিছু নাই। সবই মনের ভূল।

খেয়াল করলাম, টিটু কেমন জানি চুপ করে আছে। সাইকেলের গতিও কমে গেছে। হাতের টর্চটা থেমে থেমে জ্বলছে নিভছে। চারপাশটায় আরও ঠাণ্ডা একটা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। আমি টিটুকে ডাকলাম...

"এই টিটু! চুপ করে আছিস ক্যানো?"

টিটু কোনো আওয়াজ করলো না। আবার ডাকলাম...

"এই টিটু কথা বল ভাই। কি হলো তোর হঠাৎ করে?"

টিটু একদম নীরব। এবারেও কোনো সাড়া নেই। আমি ওর কাঁধে হাত রেখে ঝাঁকুনি দিয়ে ডাকলাম। টিটু এবার পিছন ফিরে আমার দিকে তাকালো। তারপর যেটা দেখলাম সেটার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। টিটুর মাথাটা প্রায় ৩৬০ ডিগ্রী কোণে ঘুরে আমার দিকে তাকালো। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখতে পেলাম, টিটুর মুখের ডানপাশের মাংস উঠে গেছে, কংকাল বের হয়ে গেছে সেখানে। বাম পাশে কপাল বেয়ে কালো রং এর রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। চোখ দু'টো যেন কোটর থেকে বের হয়ে এসেছে। বাম চোখটা নেই। সেখানে বড় একটা গর্ত। আমি এতক্ষণে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে সাইকেল থেকে নিচে মাটিতে পড়ে গেছি। বিশ্বাস হচ্ছিলো না নিজের চোখকে। টিটু এগিয়ে আসছে আমার দিকে। ওর মুখে একটা অতৃপ্ত হাসি। আমার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলো। আমার হাতটা ধীরে ধীরে টান দিলো টিটু। ওর হাত এতো শীতল মনে হলো, যেন বরফ। আমি হুঁশ ফিরে পেলাম। না আমি ভুল দেখছি না, "টিটুই" মুখে একটা অতৃপ্ত হাসি নিয়ে আমার হাত ধরে টানছে।

মনে মনে দোয়া পড়ছি, আর ধীরে ধীরে চোখের সামনের সবকিছু মিলিয়ে যাচ্ছে, রাতের আঁধার আরো নিকশ কালো হয়ে আসছে। আর কিছুই মনে নেই আমার।

পরের দিন যখন চোখ খুললাম, দেখি আমি আমার বাসায় বিছানায় শুয়ে আছি। মাথার কাছে মা বসে বসে কান্না করছে। বাবা চিন্তিত মুখে দূরে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চোখ খুলতেই বাবা দৌড়ে এলেন। অস্থির হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "বাপ আমার! কেমন লাগতেছে এহন?"

আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না কিভাবে বাসায় এলাম? কাল রাতের ঘটনাটা মনে করার চেষ্টা করলাম। সবকিছু ধীরে ধীরে মনে পড়লো।

বাবা আবারও জিজ্ঞেস করলো, "ও বাপ কথা বুলছিস নি ক্যা?"

"এই তো বাবা, এখন একটু ভালো লাগছে। কিন্তু আমি তো কাল..."

"হ বাপ। কাল তোর কি হইছিলো বুল তো শুনি? ওই বটগাছটার থ্যাকি ইট্টুক দূরে মাটিতে পইড়া আছিলি।"

"আমি তো বাসস্টপ থেকে নেমে বাড়ি ফিরছিলাম। তখন ...."

"তুই যে বাড়িতে আসপি আগে বুলবিনি? আমি কাউরে পাঠাইয়া দিতু।"

"মানে!! কি বলছো বাবা? আমাকে নিতে তুমিই তো কাল টিটুকে সাইকেল নিয়ে পাঠিয়েছিলে। আমি তো ওর সাথেই ফিরছিলাম।

"কিন্তু ওই বটগাছটার কাছে আসতেই টিটুর কি যেন হয়ে গেলো আর ও ...."

"আমি কথা শেষ না করতেই বাবা টিটুর নাম শুনেই বিরাট চমকে গেলেন। বাবা ছুটে এসে আমাকে বললেন," কি বুলছিস বাপ!

"টিটু! টিটু তোক আনতে গেছিলো? তাও আবার সাইকেলে কইরা।"

"এইডা কেমনে সম্ভব রে বাপ!"

"কেন সম্ভব না? ও আমার ছোট বেলার বন্ধু। আর তুমিও তো ওকে নিজের ছেলের মতো দেখতে, তাই ওকে পাঠিয়েছো।"

মা কেঁদে কেঁদে বলে উঠলো, "টিটু তোক কি করি আনতে যাবে রে বাপ? সে তো ৩ মাস আগেই মরে গেছে।"

আমি মার কথা শুনে বড় সড় একটা আঘাত পেলাম। তার মানে আমি গতরাতে ভুল দেখিনি। বাবা বলা শুরু করলো,

"৩ মাস আগে টিটু ওর সাইকেল লইয়া গঞ্জের হাঁটে গেছিলো। বিকালের মধ্যেই চলে আসার কথা ছিলো। কিন্তু হেতি সন্ধ্যার পরেও ফিরে আসে নাই দেইখা ওর মা আমাগো বাড়িতে আইছিলো। পরে আমি আর গেরামের কয়েকজন লোক মিইলা গঞ্জের হাঁটের রাস্তা আবদি খুঁইজা আইছি। কুনো হুদিস পাইনি। পরের দিন সক্কালবেলা..."

এই পর্যন্ত বলে বাবা চোখের পানি মুছলেন। বাবা টিটুকে নিজের ছেলের মতো দেখতেন ।

মাও কতদিন আমাকে আর টিটুকে নিজ হাতে ভাত মেখে মুখে তুলে খাইয়েছে।

বাবা আবার বলা শুরু করলেন...

"পরের দিন সক্কাল বেলা লোকমান ফকির দৌড়াইতে দৌড়াইতে আইয়া কয়..টিটুর লাশ নাকি ওই বটগাছে ঝুলতাছে। আমরা প্রেথমে বিশ্বাস করবার চাই নাই। দৌড়াইয়া যাইয়া দেহি আমাগো টিটু বটগাছে ঝুলতাছে।"

কথাগুলো শেষ করে বাবা আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না, ডুকরে শব্দ করে কেঁদে উঠলেন।

আমার চারপাশটা কেমন খালি খালি লাগতে শুরু করলো। টিটু আমার সেই ছোটবেলার বন্ধু। গ্রামে এলে ওকে ছাড়া এক দণ্ডও থাকি না। আর সেই টিটু নাকি আর নেই। মানতেই পারছিনা আমি। আমি বাবাকে জিজ্ঞেস করলাম," কেনো টিটু ওইভাবে আত্মহত্যা করলো? জানো কিছু?"

"হেতি তো নিজে ফাঁস দেয়নি বাপ, হেতিরে মাইরা ফালাইছে। হেতির মুখের একপাশের মাংস উঠা ছিলো কপালডা কাটা আছিলো। ওর সাইকেলডাও পাওয়া যায় নাই। তয় কেডায় মারছে এহনো জানে না কেউ।"

আমি ঘর থেকে বের হয়ে এলাম। আমার সবচেয়ে কাছের বন্ধুবিহীন পথ। কুয়াশার চাদর ভেদ করে যেন টিটু ছুটে আসবে এক্ষুনি এসেই বলবে," কিরে ইমু, কহন আইলি?

মহামারী শেষ হবে

শাহরুখ খান আকাশ
আইন বিভাগ, ব্যাচ-২০১৯

বিচ্ছিন্ন ক্ষতের দাগ রয়ে গেলেও,
মহামারী শেষ হবে।
ভেজা চোখ শুকাবে, স্বপ্ন দেখবে
আগের চেয়ে রঙিন।
একা থাকা সয়ে গেলেও,
আমাদের আবার দেখা হবে।
টুকরো মনের সেলাই হবে
একটু একটু প্রতিদিন।
সুস্থ বাতাস বুকে নিয়ে
স্বাধীন চলবো আবার।
তুমি থাকবে, আমিও থাকবো
সময় থাকবে, তারা গুনবার।
খালিপায়ে মাঠ পেরোবার
সাঁতার না জানলেও,
হরিণঘাটায় নাকডুবো জলে আমি গা ভেজাবো।
আসর বসলেই গান হবে।
মনপুরার মৃদু বাতাসে
আবার চুমু খাবে।
বিইউপির আনাচে-কানাচে
গলা ছেড়ে এবার
তোমাকেও গাইতে হবে।
চায়ের আড্ডায়
এবার আরো আয়োজন হবে।
কথা দিচ্ছি, সবই হবে
আগের থেকেও ভালো হবে।
এবার আমাদের দেখা হলে,
তুমি আপন থেকেও আপন হবে।
স্বাধীন চোখে দেখবো যখন,
পৃথিবী আরো সুন্দর হবে।
কিছু কষ্ট স্থায়ী হলেও
মহামারী শেষ হবে।

লজেন্স

আফসারা তাসনীম শাম্মী
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাচ-২০১৮

নদনা গ্রামের হাতে গোনা কয়েকজন আপেল ফলটার নাম জানে। সদরের বাজারে এসব বিলেতি ফলের দেখা মিলে কালে-ভদ্রে। শহুরে আত্মীয়রা এলে কখনো নিয়ে আসে। সে প্রায় তিরিশ বছর আগেকার কথা।

সেসময় কাদের সরকারের বাড়িতে আপেল নিয়ে বেড়াতে এলো তার এক বন্ধু। কাদের সরকারের বউ তখন অন্তঃসত্বা। মাস কয়েক পর তাদের দ্বিতীয় মেয়ে হলো। ফুটফুটে মেয়ে, দুধে-আলতা গায়ের রঙ। কাদের সরকার আদর করে নাম রাখলেন "আপেল"। সময় দ্রুত অতিবাহিত হলো। কাদের সরকার বড় মেয়ের বিয়ে দিলেন। বিয়ে বাড়ির সবাই বললো-

"অহন তাড়াতাড়ি আপেলরেও বিয়া দিয়া দাও। মাইয়া সুন্দর ভালা জামাই পাইবা।"

আপেল তখন সবেমাত্র কলেজে উঠেছে। তিন-চার গ্রামে একটাই গার্লস কলেজ, সদরে। বেড়িবাঁধের উপরের রাস্তা দিয়ে লম্বা পথ হেটে কলেজে যায়, সাথে থাকে বান্ধবীরা। তারা গল্প করে, হাসে। হাসলে আপেলের গালে টোল পরে। গ্রামের কোনো বুড়ি দেখে বলে উঠে-

"কি কাল আইলো রাস্তায় মাইয়ারা এমনে হাসে। লজ্জা শরমের বালাই নাই, কত পোলারা থাকে।"

অনেক ছেলে হয়ত থাকে, কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে তাকায়। তবে রোজ দাঁড়িয়ে থাকে একটা ছেলে। শীর্ণ ভীত ছেলেটা হাটে ওদের পিছু পিছু তবে কিছুই বলে না। আপেল আর ওর বান্ধবীরা মুচকি হাসে। ওদের আলোচনার প্রাত্যহিক বিষয় হয়ে উঠলো ছেলেটা। ছেলে ওদেরই সমবয়সী, নাম সজীব। পাশের গ্রামের নজরুল মেম্বারের ভাই। একদিন আপেল ডেকে জিজ্ঞেস করলো-

"কিছু বলবেন? রোজ পিছু পিছু হাটেন কেন?"

ইতস্তত হয়ে হাতের মুঠোয় রাখা সবুজ কমলা রঙের লজেন্স বাড়িয়ে দিয়ে সজীব বললো-

"ইয়ে মানে, লজেন্স তোমাদের জন্য।"

"আমরা বাচ্চাদের লজেন্স নিয়ে কি করবো? পাশ থেকে রোকেয়া বলল।"

"তোমাদের বাড়ির ছোটদের দিও।"

এভাবেই বেশ কিছুক্ষণ কথা হয়েছিল তাদের। সেই শুরু হয়েছিল তারপর থেকে কথা হতো অল্প সময়ের জন্য। সজীবের অনেক কথা জমে থাকে। বলা হয় না, যদি কেউ দেখে ফেলে।

কয়েকদিন পরেই ঈদ। আপেলের বাড়িতে অনেক মেহমান। আপেলের মা বললো-

"ঈদের আগে আর কলেজে যাওনের দরকার নাই। তোর বান্ধুবীরাও তো যাবে না এই কয়েকদিন। এতো রোজ

রোজ কলেজে যাওয়া কেন? আগে তো যাইতে চাইতি না।"

বাহানা বানিয়ে আপেল সেদিন কলেজে গেলো। ফেরার পথে সজীবের সাথে দেখা, হয়তো এর জন্যই আপেলের রোজ কলেজে আসা। সেদিন কথা হলো অনেকক্ষণ। শেষে আবার কয়েকটা লজেন্স এগিয়ে দিলো সজীব।

-"লজেন্স দিয়ে কি করবো"?- আপেল বলল।

-"বাড়ির ছোটদের দিও, ওদের জন্য।"

-"বাড়িতে তো অনেক মেহমান, ছোট পোলাপাইনতো অনেক। এই কয়টা লজেন্স কি হইবো?"

-"তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনি আসতেছি।"

-"এখন আর যাওয়া লাগবো না, কালকে বেশি করে আইনেন।"

-"কালকে আসবে তো?"

-"আবার দেখা হবে"? বলেই হেসে চলে গেলো আপেল।"

পরের দিন এক বয়ম লজেন্স নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল সজীব। আপেল আসেনি। তারপরের দিনও না। ঈদের পরেও না। তবে আবার দেখা হয়েছে তাদের আজ। বাসে সজীবের পাশের সিটে এসে বসলো আপেল।

-"আপেল" সজীব বললো।

-"কেন চেনা যায় না?"

-"না, তা না। তোমার সাথে দেখা হবে আবার এভাবে।"

সেই আগের ইতস্তত কণ্ঠ। আপেল হাসলো। জিজ্ঞেস করলো

-"কেমন আছেন আপনি?"

-"এইতো"

আপেলের কোলে বসা মেয়েটার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো,

-'তোমার মেয়ে ভারী মিষ্টি তো, নাম কি রেখেছো? '

-'ফাইজা।'

-"বড় হয়ে গিয়েছে।"

-"এইতো চার বছর চলছে।"

-"মেয়েকে নিয়ে একাই থাকো?"

-"জানেন তো সব।"

মোটামোটি গ্রামে কিছু হলে সবাই জানে। আপেলের গল্পটাও কম বেশি জানে সবাই। ঈদের আমেজ শেষ হওয়ার আগেই আরেক উৎসব হল কাদের সরকারের বাড়িতে। আপেলের ফুফু সম্বন্ধ আনলো। পাত্র তার পরিচিত, বিদেশে থাকে। টাকার অভাব নাই। দেশে কয়েকদিনের জন্য এসেছে, বিয়ে করেই চলে যাবে। সময় কম। বিয়ের দিন সারা সকাল আপেল বান্ধবীর বাসায় বসে রইলো।

অনেক বুঝিয়ে বাবার মান সম্মান এর দোহাই দিয়ে বিকেলের মধ্যে আপেলের বিয়ে হয়ে গেলো। সময় ভালোই কাটছিলো। ভালোই ছিল আপেলের শ্বশুরবাড়ির লোকেরা। বাসায় পড়েই কোনোরকম আইএ পরীক্ষা দিলো। মাঝে মাঝে আসে বাপের বাড়ি। অন্য সব বারের মতোই সেবারও বাড়ি এলো। এক বছরের মেয়েকে কোলে নিয়ে তবে, একেবারের মতো। তার স্বামী আগেও একটা বিয়ে করেছিল, তিন মাস সংসার করেছিল। সে বউ ফেরত এসেছে। আপেলের স্বামী তখন বিদেশ। দেশে এসে আপেলকে নিতে এসেছিলো কয়েকবার। বাবা মা বুঝেয়েছিল। বাবা ছাড়া বাচ্চার ভবিষ্যৎ কি? একটা মেয়ে নিয়ে সারাজীবন কিভাবে পার করবে? আরো কত কত উপদেশ। যার সাথেই দেখা হতো সেই সব জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দিতো। কেউ কেউ দ্বিতীয় বিয়ের কোথাও বললো। আপেল এইবার আর শুনেনি তাদের কথা। মেয়েকে নিয়ে নতুন জায়গায় সব নতুনভাবে শুরু করেছে। খুব কাছের আত্মীয় ছাড়া কেউ জানে না আপেল কোথায় থাকে। মাঝে মাঝে পরিচিত কারো সাথে দেখা হয়।

আজকে হলো সজীবের সাথে। আজকেও খুব একটা কথা হলো না তাদের। দীর্ঘ সময় নীরবতা। সজীবের জমে থাকা কথা আজকেও বলা হয় না। শুধু তাকিয়ে থাকে। নীরবতা ভেঙে আপেল বললো,

-"পরের স্টপেজে নামবো এইতো আর কিছুক্ষণ।"

-"তোমাদের সাথে নামি? মামনিকে প্রথম দেখলাম। চকোলেট, চিপস কিছু কিনে দেই?"

-"এসবের কোনো প্রয়োজন নেই। করবেন না প্লিজ। আমি আপনার হয়ে কিনে দিবো।"

-"তোমার জন্য কয়েকটা লজেন্সও কিনো।"

আপেল হেসে বললো, -"এখানে মনে হয় না লজেন্স পাওয়া যায়।"

-"চলো কোথাও বসে গল্প করি। আমার বাসায় চলো না?"

-"না, আজকে কাজ আছে।"

স্টপেজ চলে এসেছে। আপেলের নেমে যাওয়ার সময় হয়েছে।

সজীব বলে উঠলো- "কিভাবে যোগাযোগ করবো?"

-"আবার দেখা হবে।"

বলেই হেসে চলে গেলো আপেল। হাসলে এখনো তার গালে টোল পরে।

অব্যক্ত কথা

প্রভাষক তাহমিনা সুলতানা
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ

সুখের লাগি মরছি মোরা
ভাবছি মোরা সবে।
সুখের খোঁজে ব্যস্ত মোরা
সারাক্ষণ এই ভবে।
কোথায় স্বর্গ লুকায়ে রয়েছে
কোন সে নিরালায়-
কোন পথেতে খোঁজ পাব
তার ব্যস্ত সবাই তায়।
সুখের-স্বর্গ খুঁজতে গিয়ে
আছে সবাই রত,
সুখের চিন্তায় গিয়েছে বেড়ে
অন্তর আত্মার ক্ষত।
সুখ সুখ করে হাঁক ছাড়িছে মিছে-
পায়নি কভু দেখা,
নিজেরই ভিতর বিরাজ করে
সুখের সরু রেখা।
চিন্তায় হলে প্রশস্ত আর কর্মে হলে সৎ,
সুখের তরী আপনি খুঁজিবে তোমার চলার পথ।

Gambler's Fallacy

G.M. Naimuz Saadat
Dept. of Finance and Banking, Batch: 2019

The house always wins. Do you know why? Because human beings are impulsive and gullible. Impulsion and gullibility are subjective concepts, so let's measure that in a quantitative manner. The year is 1913. People are playing Russian Roulette in a casino. The ball has dropped several times on black. What do you think, where the ball will fall on next? Well, like you and me the people also thought that on the next turn, the ball would fall on red. People betted on red. The ball fell on red after 27 turns. Needless to say, the house won millions that night. You would think, that people are smart enough to realize their mistakes but no. Fast forward to 2008, the housing market crash. Again, bankers, policymakers, the whole financial sector thought "who doesn't pay their mortgage?" But they were wrong, defaults were soaring, and ultimately the market crashed.

On both occasions, people assumed that probability changes based on past results. But that is not true. When a coin is flipped, the probability of getting head or tail is 50/50. It does not change even if the coin is flipped a 100 times. Every time you flip a coin the probability will be and is 50/50 of getting head or tail.

But regardless of the statistics, people assume on the basis of past results, this is called Gambler's fallacy. The Gambler's Fallacy line of thinking is incorrect because each event should be considered independent and its results have no bearing on past or present occurrences. For instance, a coin flip is an independent event. No matter how many times a coin has flipped the probability of getting head or tail is the same. On the other hand, imagine that a detective is chasing a robber. The detective has shortlisted 20 houses where there is a probable chance of finding the robber. So, the probability of finding the robber in the first house is 1/20. After searching the first house, he didn't find the robber, so the probability of finding the robber in the second house increase to 1/19. This is a dependant event. The result of the outcome is dependent on each experiment conducted.

Now, it is important to understand what the probability entails. It does not tell you, when and how a thing is going to happen, it entails what is the likes of an event's occurring. The 1/19 probability doesn't mean that the detective will or will not find the robber in the second house. It means that if there are 19 individual events of searching for the robber, the detective will find the robber in 1 of those events and won't find the robber in 18 of those events. It does not tell you on which event the detective will find the robber.

This makes gambler's fallacy a dangerous phenomenon. Human beings are impulsive and gullible, they like to trust what they have seen not what they might see. That's why the market crashed in 2008, that's why the house won millions on the night of 1913.

There are only a few who can transcend gambler's fallacy, that's why the likes of Michael Burry and a few others, shorted the housing bonds in 2008 and gained millions of dollars. They didn't give in to their impulse, they saw the numbers and bet on it.

Human impulse is hard to beat, but to be a good investor, emotions should be left aside. Nobody knows anything, the table in the casino has no memory, the coin doesn't remember where it landed the last time. The only thing constant is that nothing is constant.

Life

Shourovi Akter
Dept. of Public Administration, Batch: 2020

What is life?
Life is nothing but full of love,
And love for all the creations of God.
What is love?
Love is nothing but tenderness of heart
And it's a feeling good for others.
What is life?
Life is nothing but a dream,
And it's a meaningful dream.
What is dream?
Dream is nothing but an idea and a vision
And it makes fulfill our mission.
What is life?
Life is nothing but full of sorrows
When we follow the wrong path
And avoid the right path.
Oh God! enable us to follow the right path
And make our life successful.

গল্পের নামঃ যোগসূত্র

কাজী সিয়াম
পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিভাগ, ব্যাচ-২০২০

১। বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান সরলা। সবাই বলে নামটা ওর স্বভাবের বিপরীতার্থক। সোনাডাঙা গ্রামে এরকম মেয়ে দুটি নেই। মা হারা তেরো বছরের অনবদ্য এ কিশোরীর অধিকাংশ সময়ই পার হয় বাড়ির পেছনের পুকুরপাড়ে বা তার ওপারের কাঁঠালতলায়। সেই কাঁঠাল গাছের পাশেই রয়েছে আরও নানান গাছ। কোনোটা ফুল দেয়, কোনোটা ফল দেয়, আবার কোনোটা নিজের সর্বদেহ মানুষের মানুষের কল্যাণে বিলিয়ে দেয়। এর মাঝেই মনে হয় বৃক্ষের সার্থকতা নিহিত। সেবার বর্ষায় পানিতে থৈ থৈ করছে পানির আশ্রয়স্থলগুলো, জায়গার অভাবে ছেয়ে পড়েছে পথ ঘাটেও। এ অবস্থার ব্যতিক্রম নয় সরলাদের বাড়ির পুকুরটিও। তাই সরলা ডিঙি নৌকা নিয়ে নিজ হাতে বৈঠা চালিয়ে চলে গেল ওপারে, লক্ষ্য ছিল পাশের কাজী বাড়ির জাম গাছ থেকে জাম চুরি করা। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ বোধ হয় রাগ করেছে, ভার মুখে স্থির হয়ে আছে। তবে কখন যে জলধারা পতিত হবে তা বোঝার জো নেই। টুপ করে গাছে উঠে নিয়ে এলো গুটিকয়েক জাম, কোমরে পায়জামায় গোজা একটি মোড়ানো কাগজ থেকে বের করল মরিচের গুড়ো ও লবণ। নারকেলের ভেতরের শক্ত অংশ দিয়ে বাটি তৈরি করে জামগুলো মেখে ফেললো নিপুণভাবে। এদিকে বৃষ্টিও শুরু হয়েছে অঝোর ধারায়। আঙুল চাটতে চাটতে ছুটলো কাজী বাড়ির দিকে। আশ্রয় নিলো ঘরের চালের বাহিরের দিকটার নিচে। বৃষ্টির ছিটেফোঁটা এসে পড়ছে ওর চোখে মুখে। পাশেই বাড়ির দক্ষিণের জানালা হওয়ায় ভেতরের সবকিছু স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে। কাঁদো কাঁদো সুরে নারী কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে আর্তনাদ। তবে এ আর্তনাদের কারণ জানা নেই সরলার। উদাসীন মনের সরলা মুহূর্তেই পয়ত্রিশ বছরের বুঝদার নারী হয়ে উঠলো। সে ভাবছে, কেন এই নারী কণ্ঠে আর্তনাদ? কী নেই তার? নাকি কিছু হারিয়েছে? সকল প্রশ্ন কড়া নাড়ছে মনের ভেতরে উত্তরের আশায়। কৌতূহলী মনে তাই উত্তরের সন্ধানে সরলা কান পেতেছে জানালায়। নারী কণ্ঠের একটি বাক্য শুনেই বুকের মধ্য থেকে হু হু করে একটা হিম বাতাস শিরদাঁড়া বেয়ে নিচে নেমে গেল। সে শুনতে পেল নারী বলছে, তাহলে খোকন সব জেনে গেছে যে ও আমাদের সন্তান না। আর সে কারণেই ও নিজের জীবনের সমাপ্তি ঘটালো এমন করে? হো হো করে কেঁদে উঠলো নারী কণ্ঠ। আকাশ থেকে বর্ষণ যে বন্ধ হলো সেদিকে খেয়াল নেই সরলার। কথা শুনছে নিগুঢ়ভাবে। হঠাৎই কানের কাছ থেকে ফিস ফিস করে একটি দমকা হাওয়া কি যেন বলতে বলতে বয়ে গেল, হুঁশ ফিরলো তার এবং নিজের অজান্তেই একটি সাদা কাপড়ে মোড়ানো লাশের উপর গিয়ে তার চোখ আটকে গেল। না, ভয় পায়নি সে। বুঝলো, এই ছেলেই তাহলে আত্মহত্যা করেছে। হরেক রকমের প্রশ্ন মাথায় খেলা করছে সরলার। নিজেকেই নিজে বলতে লাগলো, "কতো সুন্দর এ পৃথিবী, এ জীবন, কতো কিছুই না আমরা পেলাম এই পরিবার, বাবা-মা, কতো আপনজন, এ নন্দনকানন ছেড়ে স্বেচ্ছায় কেউ কিভাবে নিজের মূল্যবান জীবনের সমাপ্তি ঘটায়? তবু কি স্বেচ্ছায় আবেগের তাণ্ডব! আবেগের কাছে সকল কিছুই হেরে যায়?" বকুল ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেছে চারপাশে। গাছটির সন্নিকটে গিয়ে সরলা আদর করতে শুরু করলো ফুল ও পাতাগুলোকে। হ্যাঁ সে ভুলে গেছে কিছুক্ষণ আগের বিরহ। চঞ্চলা মনে নাচতে নাচতে ফুল-পাতায় আলতো ছুঁয়ে ছুঁয়ে গান গাচ্ছে। তবে আচমকা গুটিকয়েক পাতার আড়াল থেকে চোখ পড়লো সীমাহীন গগনে বিস্তৃত আকাশী রঙের মাঝে আরও কয়েক রঙের খেলা। এটাই তাহলে রংধনু! বলে উঠলো সরলা। মা বলেছিল, আমাকে রংধনু দেখাবে। কথাও দিয়ছিল। কিন্তু কথা না রেখেই সে চলে গেল, যেখান থেকে নাকি কখনোই ফেরা যায় না! আজ মা থাকলে আমরা দুজনে একসাথে দেখতাম আকাশের মাঝে এই হলি খেলা, খুঁজতে যেতাম এই রংধনুর প্রান্তবিন্দু, বিড়বিড় করে বলতে লাগলো একাই। নিয়ে আসা আনন্দ এতক্ষণে সরলার মাঝ থেকে বিদায় নিয়েছে। এখন মনের পুরোটাই দখল নিয়েছে কষ্ট আর কষ্ট!

২। মিলি, এই মিলি ওঠ! সকাল গড়িয়ে দুপুর হলো যে। উঠে পর মা। বন্ধের দিন বলে এতো সময় ঘুমোতে হবে?" বার বার বলেই চলছে সরলা। একমাত্র মেয়ে মিলি আর স্বামীকে নিয়েই তার বর্তমান জীবন। তের পার হয়ে আজ পয়ত্রিশ বছরের নারী হয়েছে সরলা। বয়সের সাথে সাথে চরিত্রেরও পরিবর্তন ঘটেছে তার, হয়ে উঠেছে কর্তব্যপরায়ণ, সংযমী, কর্মদক্ষ ও সাংসারিক। ভোর হলেই জলখাবার তৈরির কাজ সেরে মেয়েকে ঘুম থেকে উঠিয়ে নিয়ে স্কুলে দিয়ে আসে। এসে স্বামীর অফিসের খাবার তৈরি করে। স্বামীর যত্নে কোনো ত্রুটি নেই তার। সম্পর্কটাও মজবুত। এভাবেই জীবন অতিবাহিত হচ্ছে সরলার। কাল মিলির জন্মদিন। শুয়ে শুয়ে ভাবছে। বাবা-মা কি করা যায় এবারের জন্মদিনে তাদের একমাত্র মেয়ের জন্য? সরলা তার স্বামীকে জিজ্ঞেস করলো। এমন সময় ফোন আসলো খোকনের, সরলার স্বামীর বন্ধু খোকন। কিন্তু এর আগে কখনো তার স্বামী এ নামের কারও কথা বলেনি সরলাকে। খোকন নামটা শুনেই সরলার সেই বাদলা দিনে কাজী বাড়ির খোকনের লাশের কথা মনে পড়ে গেল। চকিত হয়ে ভাবছে সরলা। সকল পুরোনো স্মৃতি তার চোখের সামনে প্রতিচ্ছবি হয়ে ভাসছে। এমনই সময় সরলার স্বামী বলে উঠলো, "চলো, এবার তাহলে তোমাদের সোনাডাঙা গ্রামেই জন্মদিন পালন করি। মিলিও তো কখনোই যায়নি ওখানে, সেই বিয়ের পর তো আর আমাদেরও যাওয়া হয়নি। শহুরে এ যান্ত্রিক জীবনের কোলাহলে অতিষ্ঠ হয়ে গেছি। প্রকৃতির সংস্পর্শে গেলে মনটাও ভালো লাগবে আর মিলিও তো এ খবর শুনে যতটা খুশি হবে তার চেয়ে অনেক বেশি অবাক হবে। কি বল?" সরলা গম্ভীর হয়ে অকপটে ভাবছে। সরলা, এই সরলা কি হলো?" নাড়া দিতেই চমকে উঠে কেমন ঘোরের মধ্যে বললো, "চলো তাই হোক।" বাপের বাড়িটাও দেখে আসি। বাবা-মা না থাকলে তো আর বাপের বাড়ি থাকে না। তাও চলো ঘুরেই আসি। মিলিরও শখ।"আচ্ছা সরলা," মিলিকে না জানিয়ে যদি নিয়ে যাই কেমন হয় বলতো? এটাই ওর এবারের জন্মদিনের উপহার হবে। কি বলো? হ্যা ভালোই হবে এখন ঘুমিয়ে পড়। আলোর অনুপস্থিতিতে চোখটা নিভে এল সরলার কিন্তু চোখ নিভে গেলে যে অন্ধকার দেখার কথা তবে এ কোথায় এল সরলা? একটি পুকুরপাড়ে সাদা কাপড়ে জড়ানো একটি মানুষ তাকে ডাকছে সাহায্যের জন্য। ডাকছে, শুধুই ডাকছে, করুণ, সে আর্তনাদ। তবু কিছুই করতে পারছে না সরলা। হঠাৎ সাদা কাপড়ে জড়ানো সেই মানুষটি জলে পড়ে যায় এবং ডুবে যায়। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে সরলা। এরকম স্বপ্ন কখনও দেখেনি সে। ভয়ে গলা শুকিয়ে গেছে। জল খেতে গিয়ে দেখে সারা ঘরের কোথাও এক ফোটা জল নেই। হাহাকার করছে, নিঃশ্বাস মনে হয় এখনি বন্ধ হয়ে যাবে। বাথরুমে ট্যাব ছেড়ে দেখে সেখানেও পানি নেই আচমকা একটি আওয়াজ শুনতে পেল, পরিচিত একটি কণ্ঠস্বর তাকে ডাকছে সাহায্যের জন্য অবিরত ডেকেই চলেছে এ যে সেই পুকুরপাড়ের মানুষটি একে কি আদৌও মানুষ বলা যায়! সাদা কাপড়ে সারা শরীর ঢেকে আছে তার, হেঁটে আসছে তার দিকেই সরলা ভাবলো হয়তে হ্যালুসিনেশন হচ্ছে সে নিজেকে সামলে নেয়ার চেষ্টা করছে ওমনি কাঁধে একটি হাতের স্পর্শ অনুভব করে সজোরে চিৎকার করলো, সরলা এই সরলা কি হল তোমার? ঘুমের মধ্যে কিসব আবোল তাবোল বকছো কোনো দুঃস্বপ্ন দেখলে বুঝি? সরলা কোনো উত্তর দিল, "না"। সে রাতে আর ঘুম হলো না। ভোরে উঠে ঘরের কাজ ও মেয়ের জন্মদিন উদযাপনের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মিলিকে বিস্মিত করার জন্য কিছু না জানিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তবে এটুকু বলা হয়েছে যে এটাই তার উপহার। বাড়ির কাছাকাছি এসে পড়তেই ঝুম বৃষ্টি শুরু হলো। মিলির ফুরফুরে মনটা খারাপ হয়ে গেল মুহূর্তেই। তবে কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশের কান্না বন্ধ হলো আর মিলিও হাসিখুশি হলো। আগেকার রাস্তা আর নেই। নতুন রাস্তা কাজী বাড়ির ওদিক থেকে সরলাদের বাড়ির দিকে ঢুকেছে। কাজী বাড়ির সামনে আসতেই সরলার গতরাতের দুঃস্বপ্নের কথা মনে হল এবং তার স্বামীকে গাড়ি দাঁড় করাতে বললো। বের হয়ে তার ছোটবেলার কথা মনে পড়লো। একদিন এখানেই সে দাড়িয়ে ভাবতো মায়ের সাথে রংধনু দেখার কথা আর কান্না করতো। আজও আকাশের মাঝে রংধনু স্থান করে নিয়েছে। তবে আজ সরলা অনেক খুশি। কারণ সে আজ মা আর তার একটি মেয়েও আছে যাকে নিয়ে সে আজ রংধনু দেখবে। হঠাৎ সরলা অবচেতন মনে বিড়বিড় করে বলল,"তবে কি কালকের স্বপ্ন দেখা আর অনাকাঙ্খিত এখানে চলে আসা দুটোই সংযুক্ত?"

অতলে এক স্বগত ডুব, খুঁজে পাওয়া প্রিয় গভীর আত্মীয়

মো. ইমরান হোসেন
এমবিএ ১৯ (রেগুলার), ব্যাচ-২০১৯

সূর্যোদয়গুলো কেমন যেন
একাগ্র নিঝুম আত্মবিলাসের মাঝে হঠাৎই বলে দিল-
'যাও ঘুমিয়ে পড়'।
আক্ষেপ এখনো অনেকেরই কাটেনি
সভ্য হয়ে ওঠেনি রহস্যের বিসর্জন
আড়াল করে আর কত রাখা যায়-
বিদীর্ণ এ তাজা ক্ষত?
ডুবে যাচ্ছি গভীরে; এই এখানে, অন্তিম অতলে
হারিয়ে ফেলছি সেই উত্তাপ, আগলে রাখার টান
গলার কাছেই কি একটা যেন কাঁটার মত বিঁধেই থাকে!
সূর্য পেরিয়ে যাচ্ছে রাতের পাহাড়,
প্রবণতা পাল্লা দিচ্ছে সেই নিরাশার তুবড়ি ঘেঁষে।
স্বগোক্তিতে দৌড়াচ্ছি অসত্য গতিতে, সব ফেড়ে-ছিঁড়ে-খুঁড়ে!
হঠাৎ জড়িয়ে ধরলো কে যেন, হুমড়ি খেলাম তার উপর;
আমার ভেতরে কাঁদছে কেউ, কিংবা করছে উল্লাস!
'কোথায় ছিলি? খেতে আয়'-কে বলবে আর?
ভেবে বিকট শব্দে ধসে পড়লো উচ্চতা আর বয়স!
প্রচন্ড ক্ষুদ্র লাগছে নিজেকে, কয়েক ইঞ্চি মাত্র
জেগে আছি খুব পরিচিত অচেনা কোথাও
ভয়ের কোন বালাই নেই, বেশ নিরাপদ বোধ করছি।
নাভি থেকে ঝুলে আছে নালির মত কিছু একটা;
যার একপ্রান্তে আমি বাঁধা, অপরপক্ষ আড়ালে
চুষে খাচ্ছি কারো রক্ত, তার স্নেহের প্রশ্রয়ে
জন্ম নিচ্ছে কোষ-কণিকা, জন্ম নেব আমিও
পরবর্তী প্রশ্রয়গুলো ততোধিকই জীবন ঘনিষ্ঠ
মুচোরা এক গো-বেচারার খামখেয়ালীর আশ্রয় যেমন।
"কিভাবে থাকিস এগুলো ছেড়ে? আবার হাসিস'!"
বললাম- 'ভালোবাসি মা, পাগলের মত'।
পলক ফেলার উপায়ই নেই-
কান্না থেকে আর্তনাদ শুরু হয়ে গেল তার!
এদিকে আবার হাসি পাচ্ছে আমার;
সর্বশান্তির ললাট চুমে,
মাতৃবাৎসল্যে ভেসে যাচ্ছি কাল্পনিক স্বেচ্ছায়।

ডিএনএ আঙ্গুলের ছাপ
(DNA Fingerprinting)

তোফায়েল আহমেদ
শাখা কর্মকর্তা, ওইএফসিডি

বিস্ময়কর আমাদের এই সৃষ্টিজগত। সৃষ্টিকর্তা তার নিপুণ সৃষ্টিশৈলীতে সৃষ্টি করেছেন এই বিশ্বজগত। এই বিশ্বজগতে রয়েছে বৈচিত্র্যময় সব সৃষ্টির সমাবেশ। এই সৃষ্টিজগতের মধ্যে একটি হলো প্রাণিজগত। প্রাণিজগতের প্রতিটি প্রজাতির রয়েছে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, স্বকীয়তা ও পরিচিতি। একই প্রজাতির সব প্রাণির মধ্যে শত মিল থাকলেও একটি ক্ষেত্রে রয়েছে বিশেষ ধরণের অমিল যা পরস্পরকে পরস্পর থেকে করেছে সম্পূর্ণ পৃথক । এই অমিলটি প্রাণির চলনে, আচরণে কিংবা বৈশিষ্ট্যে প্রকাশিত নয়, প্রকাশিত হয় কেবল তার ডিএনএ (DNA)-তে। DNA কে সহজভাবে বলা যেতে পারে একটি প্রাণীর মূল অণু বা মাস্টার মলিকিউল। প্রতিটি জীব তার জৈবিক বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে আছে তার শরীরের প্রতিটি কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত ডিএনএতে। এই ডিএনএর বিন্যাসে এমন কিছু রাসায়নিক উপাদানের সিকুয়েন্স থাকে (যাদেরকে নাইট্রোজেন বেস বলে) যা একটি প্রাণির থেকে অন্যটিতে ভিন্ন। তবে সন্তানের সাথে পিতা কিংবা মাতার সেই বিশেষ সিকুয়েন্স এর মিল থাকে। সহজ ভাষায় দুই বা ততোধিক প্রাণি বা মানুষের ডিএনএর বিশেষ বিশেষ অঞ্চলকে তুলনাপূর্বক তাদের মাঝে মিল বা অমিল খুঁজে প্রকৃত প্রাণি বা মানুষের তথ্য সনাক্তকরণ করা যায়। প্রকৃত প্রাণি বা মানুষের তথ্য সনাক্তকরণের আর এই বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে বলা হয় ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং শব্দটি ডিএনএ টাইপিং, ডিএনএ প্রোফাইলিং নামেও সর্বাধিক পরিচিত। ডিএনএ কী, কিভাবে এর ফিঙ্গারপ্রিন্টিং বা প্রোফাইলিং হয় তার আদ্যোপান্তই আজকের আলোচ্যবিষয়-

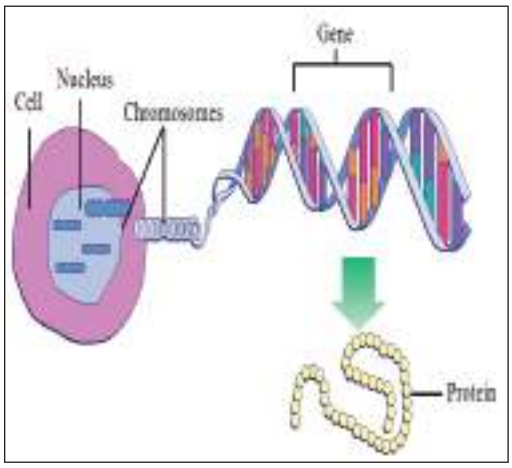

এক. বংশানুক্রমিক বৈশিষ্ট্যধারী এককের পৃথকীকরণ সম্পর্কে সর্বপ্রথম অস্ট্রিয়ার ধর্মযাজক গ্রেগর জোহান মেন্ডেল (১৮২২-১৮৮৪) ধারণা দেন। ১৮৫৭-১৮৬৪ সাল পর্যন্ত দীর্ঘদিন মেন্ডেল মটরশুঁটি নিয়ে গবেষণা করেন এবং পিতা-মাতা থেকে কিভাবে পরবর্তী বংশধরদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের স্থানান্তর ঘটে তার পর্যবেক্ষণ করেন। তবে তিনি বংশধরগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বলে পরিচিত জিন বা ডিএনএ শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি একে ফ্যাক্টর বা কণা বলে অভিহিত করেন। ১৯০৫ সালে সর্বপ্রথম উইলিয়াম বেটসন "জেনেটিক্স" শব্দটি ব্যবহার করেন। তারপর ১৯০৯ সালে ড্যানিশ উদ্ভিদবিদ উইলহেলম জোহানসন মেন্ডেলের ফ্যাক্টর বা কণা বলে অভিহিত জীবের বৈশিষ্ট্যের বাহককে জিন বলে নামকরণ করেন। এরপর দীর্ঘ গবেষণার পর ১৯১২ সালে টি এইচ মরগান প্রমাণ করেন যে, বংশধরগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক বলে পরিচিত জিন মূলত কোষের ক্রোমোজোমে অবস্থিত।

দুই. বিজ্ঞানীরা যখন জিন এর তত্ত্ব আবিষ্কার করতে সমর্থ হলেন তখন তারা আরো নতুন কিছু আবিষ্কারের নেশায় মেতে উঠলেন। অবশেষে ১৯৫৩ সালে J D Watson, F H C Crick ও M F H Wilkins এর সম্মিলিত চেষ্টায় DNA Chemical Structure তথা DNA Double Helix Model আবিষ্কার করে রীতিমতো সারা দুনিয়ায় জীববিজ্ঞানের গবেষণার এর নতুন দ্বার উন্মোচিত করে দিলেন যার স্বীকৃতি স্বরূপ পরবর্তীতে তারা নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

তিন. DNA যার পূর্ণরূপ Deoxyribonucleic Acid। DNA হলো মানুষ তথা প্রাণির কোষের নিউক্লিয়াসে অবস্থিত

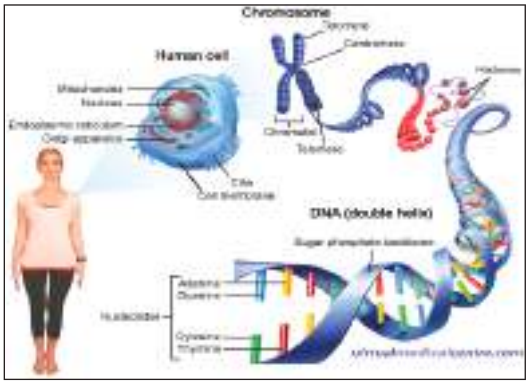

স্বপ্রজননশীল (Replicable), পরিব্যক্তিক্ষম, যাবতীয় জৈবিক কাজের নিয়ন্ত্রক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক। একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষ দশ লাখ কোটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোষের সমন্বয়ে গঠিত। মানুষের সমস্ত কোষের জৈবিক কাজের নিয়ন্ত্রক এবং বংশগত বৈশিষ্ট্যের ধারক ও বাহক DNA কে একত্রে বলা হয় জিনোম (Genome)। একটি কোষকে তাই বলা হয় ক্ষুদ্রতম একক, যা ওই প্রাণীর জীবনধারণ ও বংশবৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় সব তথ্যকে বহন করে। যদিও অঙ্গ-প্রতঙ্গ ভেদে কোষের গঠন, প্রকৃতি ও কার্যপ্রণালী ভিন্ন। তথাপি কোষের অভ্যন্তরে অবস্থিত ডিএনএ হবে এক ও অভিন্ন।

Genome এর একটি ক্ষুদ্র অংশ হলো DNA। আর DNA এর একটি ক্ষুদ্র অংশকে বলা হয় জিন (Gene)। মানুষের ভেতর এ পর্যন্ত প্রায় ৪০,০০০ জিনের সন্ধান পাওয়া গেছে, যা মোট ডিএনএ-র ১০ শতাংশের সমতুল্য। বাকি ৯০ শতাংশ ডিএনএ'র কোন কাজ নেই এবং কোন বৈশিষ্ট্যকে কোড করে না। এ ধরনের ননকোডিং ডিএনএ সাধারণত দুইটি জিনের মাঝে অবস্থান করে। এজন্য এদেরকে বলা হয়ে থাকে স্পেসার বা জাংক ডিএনএ (Junk DNA)। প্রতিটি মানুষের জন্য ৯৯.৯ শতাংশ ডিএনএ একই, পার্থক্য শুধু ০.১ শতাংশ ডিএনএতে। মজার ব্যাপার হলো এই ০.১ শতাংশ ডিএনএর অবস্থান এই স্পেসার বা ননকোডিং অঞ্চলে। দেখা গেছে, এই অঞ্চলে ছোট ছোট ডিএনএ সিকোয়েন্স বহুবার পুনরাবৃত্ত হয় এবং এই পুনরাবৃত্ত হওয়ার সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির জন্য ভিন্ন। এ ধরনের পরিবর্তনশীতলতাকে বলা হয় পলিমরফিজম (Polymorphism)। এরকমই এক ধরনের পলিমরফিক সিকোয়েন্সকে বলে মাইক্রোস্যাটেলাইট সিকোয়েন্স বা STR (Short Tandem Repeats)। STR সিকোয়েন্স ডিএনএ এনালাইসিসের জন্য সবচেয়ে উপযোগী। কারণ এখানে ২ থেকে ৭ বেস পেয়ারে একটি ডিএনএ সিকোয়েন্স অনেকবার পুনরাবৃত্ত হয়। মানুষের ডিএনএতে এরকম প্রায় কয়েকশ' STR সিকোয়েন্স রয়েছে। ডিএনএ প্রোফাইলিং তাই দুই বা ততোধিক মানুষের STR সিকোয়েন্সকে তুলনা করার একটি দ্রুততম পদ্ধতি। একটি মানব কোষের নিউক্লিয়াসের ডিএনএতে প্রায় তিনশ' কোটি বেস পেয়ার থাকে, যার এক একটা নির্দিষ্ট অংশ বা সেগমেন্টকে বলা হয় জিন যা একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যের ধারক। যেমনঃ চোখের রঙ, চুলের রঙ ইত্যাদি।

চার. ডিএনএ প্রোফাইলিং বা DNA Fingerprinting এ সাধারণত পলিমরফিক সিকোয়েন্স STR (Short Tandem

ডিএনএ ফিংগার প্রিন্টিং এর জেনেটিক অ্যালেক জেফ্রিস

Repeats) ব্যবহার করা হয়। ১৯৮৫ সালে যুক্তরাজ্যের ড. অ্যালেক জেফ্রিস DNA Fingerprinting এর এই যুগান্তকারী নীতিটি আবিষ্কার করেন। মূলত এটি পিতামাতা-সন্তানের সম্পর্ক নিশ্চিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছিল, তবে ১৯৯২ সালে জাতীয় পুলিশ সংস্থা এই পদ্ধতিটি ব্যবহার করার জন্য একটি নির্দেশিকা জারি করেছিল। কেননা এই পদ্ধতিতে রক্ত, শরীরের তরল, চুল, ত্বক ইত্যাদি থেকে ব্যক্তিদের চিহ্নিত করা সম্ভব ছিল।

পাঁচ. ডিএনএ টেস্ট বর্তমান শতাব্দীতে ডিএনএ প্রযুক্তির গুরুত্ব এবং এর ব্যবহার চিকিৎসা বিজ্ঞান, কৃষি, মৎস্য ও প্রাণীসম্পদ এবং ঔষধ শিল্পে এক

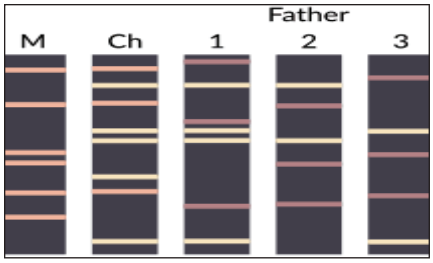

নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে। প্রচলিত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও প্রত্যক্ষদর্শী নির্ভর বিচার ব্যবস্থার পাশাপাশি আজ বাংলাদেশেও সুবিচার পাবার এক নতুন উপায় ডিএনএ টেস্ট বা ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং। ডিএনএ টেস্ট বা ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর পদ্ধতি হলো-

(১) ডিএনএ টেস্ট সুসম্পন্ন করার জন্য প্রথম প্রয়োজন জৈবিক নমুনা। ব্যক্তির হাড়, দাঁত, চুল, রক্ত, লালা, বীর্য বা টিস্যু মূল্যবান জৈবিক নমুনা হতে পারে।

(২) অপরাধস্থল বা অপরাধের শিকার এমন ব্যক্তির কাছ থেকে প্রাপ্ত জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশাকে বা Small profile তুলনা করা হয় সন্দেহভাজনের কাছ নেয়া রক্ত বা জৈবিক নমুনার ডিএনএ নকশার সাথে।

(৩) এ পদ্ধতিতে প্রথমে নমুনা থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ডিএনএ আলাদা করে নিতে হয়। পরে একাধিক সীমাবদ্ধ এনজাইম বা Small Restriction Enzyme দিয়ে কেটে ছোট ছোট টুকরা করা হয়। এক বিশেষ পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রোফোরেসিস বা Small electrophoresis এগারোজ বা পলিএক্রিলামইড জেলে ডিএনএ টুকরোগুলো তাদের দৈর্ঘ্য অনুসারে বিভিন্ন ব্যান্ড আকারে আলাদা করা হয়।

(৪) এক ধরনের বিশেষ নাইট্রোসেলুলোজ কাগজে রেডিও অ্যাকটিভ আইসোটোপ ডিএনএ প্রোবের সাথে হাইব্রিডাইজ করে এক্স-রে ফিল্মের উপরে রেখে অটোরেডিওগ্রাফ পদ্ধতিতে দৃশ্যমান ব্যান্ডের সারিগুলো নির্ণয় করা হয় এবং অপরাধস্থল থেকে প্রাপ্ত নমুনার সাথে সন্দেহভাজন নমুনার মিল ও অমিল চিহ্নিত করে তুলনা করা হয়। যেমন- অপরাধ সংঘটনের সময় ভিক্টিমের সঙ্গে অপরাধীর ধস্তাধস্তি হতে পারে, অপরাধী নিজেও জখম হতে পারে, এসব ক্ষেত্রে ভিক্টিমের জামা কাপড়ে খুনির রক্ত লেগে থাকতে পারে অথবা ভিক্টিমের হাতে বা নখের নিচে খুনির চুল বা ত্বকের কোষ থেকে যেতে পারে। ক্রাইম সিন থেকে প্রাপ্ত এ ধরনের নমুনার ডিএনএ প্রোফাইল থেকে সহজেই কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির সংশ্লিষ্টতা নির্ণয় করা সম্ভব। আর এই পদ্ধতিই হলো ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং।

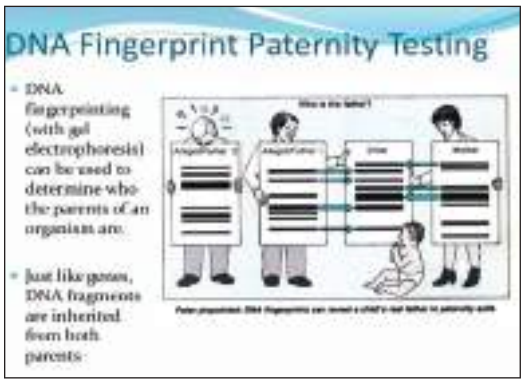

বিভিন্ন অপরাধসহ ফৌজদারী তদন্তের ক্ষেত্রে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং একটি ফরেনসিক কৌশল হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এছাড়াও খুনী সনাক্তকরণ, ধর্ষক সনাক্তকরণ, পিতা-মাতা নির্ধারণ, উত্তরাধিকার নির্ণয়সহ নানাবিধ ক্ষেত্রে ডিএনএ ফিঙ্গারপ্রিন্টিং এর ব্যবহার আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। বিজ্ঞানের এই যুগান্তকারী পদ্ধতির আবিষ্কার উন্মুক্ত করেছে সত্যের আলোকিত পথ, অপরাধীদের বিরুদ্ধে এক বিস্ময়কর অস্ত্র। মানুষের কল্যাণে বিজ্ঞানীদের এই ক্ষুদ্র প্রয়াস মানুষকে করেছে চিরঋণী।

তথ্যসূত্র:

* Lehninger Principles of Biochemistry
* Principles of Genetics
* https://en.wikipedia.org/wiki/DNA,
* https://www.newscientist.com
* https:/www.ted.com
* ছবি: গুগল থেকে সংগৃহিত

ভ্রমণ দর্শন ও রবীন্দ্রনাথ

মেজর শাহরিয়ার রহমান আবির, এএসসি
ভিসির সচিবালয়

আইরিশ কথা সাহিত্যিক জর্জ অগাস্টাস মুর বলেছিলেন, “A man travels the world over in search of what he needs and returns home to find it.” ভ্রমণ সবসময়ই ছিল মানুষের মনের খোরাক যোগানের ও মানসিক প্রশান্তি দেয়ার পাশাপাশি বিশ্বের সবচেয়ে আকর্ষণীয় ও অব্যর্থ পাঠশালা। যুগে যুগে ভ্রমণকে বিভিন্ন আঙ্গিকে দেখার ও বিভিন্ন পন্থার সাথে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতনামা সাহিত্যিক। ঐতিহাসিক কাল থেকেই সাহিত্যে ভ্রমণ দখল করে আছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক স্থান। কেননা ভ্রমণ বিষয়ক সাহিত্যের আছে বিভিন্ন মাত্রার স্বাদ, আছে দর্শনের গভীরতা এবং স্বল্পতম আয়োজনে দেশ-বিদেশ ঘোরার অপার্থিব আনন্দের যোগান। দুই মলাটের মাঝে পাঠককে দেশ-বিদেশে পদার্পণের সুযোগ করে দেওয়ায় ভ্রমণ-সাহিত্য নিঃসন্দেহে সাহিত্যের বেশ আকর্ষণীয় এক ধারা। এ ধারায় যারা সফলতার সাথে বিচরণ করেছেন তাদের মধ্যে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অবস্থান অনতিক্রম্য।

ভারতবর্ষের কথা বাদ দিলেও, ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাঁচটি মহাদেশের তেত্রিশটিরও বেশি দেশ ভ্রমণ করেছিলেন। কিন্তু ভ্রমণ কাহিনী রচনা করেছেন মাত্র চারটি। স্বল্প সংখ্যক হলেও অন্যান্য সৃষ্টির ন্যায় এই সকল সাহিত্যেও কবিগুরুর পরিশীলিত রুচিবোধ, নন্দনবুদ্ধির স্বতোৎসারণ পরিলক্ষিত হয় প্রবলভাবে। সর্বোপরি, ভিনদেশের মানুষের জীবনবোধ, আটপৌরে জীবনকে বোঝার আপ্রাণ চেষ্টা আর মূল সম্পর্কিত অনুসন্ধিৎসু অন্তর্দৃষ্টি এ সকল সাহিত্যকে করেছে অনন্য।

‘য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র’ রচনার প্রেক্ষাপট: কবিগুরুর উচ্চশিক্ষার জন্য লন্ডন গমন। মূলত পত্রসাহিত্য হলেও লন্ডনে অবস্থানকালে লেখকের দিনলিপি এবং উপলব্ধি উঠে এসেছে এই বইতে। কিশোর কবির মনের উপলব্ধিগুলোতেও দর্শনের গভীরতার ছাপ মিলে, ধারণা পাওয়া যায় আঠার শতকের লন্ডন শহরের। এখানে সমুদ্র দেখে লেখকের উদ্বুদ্ধ মনোভাব উল্লেখ করা যেতে পারে:

> ‘কল্পনায় সমুদ্রকে যা মনে করতেম, সমুদ্রে এসে দেখি তার সঙ্গে অনেক বিষয় মেলে না। তীর থেকে সমুদ্রকে খুব মহান বলে মনে হয়, কিন্তু সমুদ্রের মধ্যে এলে আর ততটা হয় না।’

এখানে তৎকালীন ইউরোপের সাথে ভারতের সমাজের তুলনামূলক এক চিত্র আমরা দেখতে পাই লেখনীতে। তুলনা করেছেন দুই দেশের সমাজেরঃ সেই তুলনাতে আছে মুগ্ধতা, আছে সমালোচনা। আছে স্বদেশীয় নারী সৌন্দর্যের অনুরাগ। এমনকি দুই দেশের প্রকৃতির মেজাজের তারতম্যও লেখক সরলীকরণ করেছেন একবাক্যে:

> ‘আমাদের দেশে যখন বৃষ্টি হয় তখন মুষলধারে বৃষ্টির শব্দ, মেঘ, বজ্র, বিদ্যুৎ, ঝড়- তাতে কেমন একটা উল্লাসের ভাব আছে, এখানে তা নয়।’

লন্ডনের দিনগুলোতে এর অধিবাসীদের সাথে একদম মিশে গিয়ে লেখক চেয়েছেন এর নাগরিকদের মত করে বেঁচে এই শহুরে-জীবনের স্বাদ আস্বাদন করতে। এখানেই রবীন্দ্র ভ্রমণ-সাহিত্যের বিশেষত্ব নিহিত। তাদের একজন না হয়েও নিজের শিকড়ের প্রতি ভালবাসা আঁকড়ে ভিনদেশকে জানার চেষ্টা এই সকল সাহিত্যের দর্শনকে দিয়েছে

অতলস্পর্শী গভীরতা। লেখক তাদের উৎসব-পার্বণের আলোচনা করেছেন, প্রত্যক্ষ করেছেন সামাজিক জীবনকে। নিত্যদিনের যাতায়াতের উল্লেখ করেছেন পাঠককে পূর্ণ চিত্র দেওয়ার প্রয়াসে। তার উল্লেখেও পাওয়া যায় প্রাণীর প্রতি মমতা, জীবনবোধ আর রসবোধের সরব উপস্থিতি:

> 'শুনলেম গাধায় চড়তে বেড়ানো ছাড়া শহরে বেড়ানোর আর কোনো উপায় নেই। শুনে শহরে বেড়াবার দিকে টান আমার অনেকটা কমে গেল, তার পরে শোনা গেল, এ দেশের গাধাদের সঙ্গে চালকদের সকল সময়ে মতের ঐক্য হয় না, তারও একটি স্বাধীন হয়ে আছে এইজনে সময়ে সময়ে দুই ইচ্ছের বিরোধ উপস্থিত হয়ে কিন্তু প্রায় দেখা যায়, গাধার ইচ্ছে পরিণামে জয়ী হয়।'

'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' গ্রন্থে লেখক লন্ডনের দৈনন্দিন জীবন পরিলক্ষিত করেছেন সামাজিক জীবনের স্তরে, নাগরিক জীবনের স্তরে। পাঠকের জন্য তুলে ধরেছেন লন্ডন ভ্রমণকালে নিজের অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টির গভীরতা, পাঠককে একজন লন্ডনের নাগরিকের জীবনের স্বাদ পেতে সার্থকভাবে সহায়তা করেছেন। কিন্তু 'রাশিয়ার চিঠি' তে লেখক তাঁর বিদগ্ধ দৃষ্টি, অভিজ্ঞতালব্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান এবং ঐশ্বরিক চিন্তা শক্তির সমন্বয় ঘটিয়ে একে অধিষ্ঠিত করেছেন কালাতিক্রম্য সাহিত্যের আসনে।

কবিগুরু যখন রাশিয়া গমন করেন তখন রাশিয়ায় এক বিশাল ঐতিহাসিক যজ্ঞ চলমান সময়টা ১৯৩০। জারের শাসন শেষ হওয়ার তের বছর পার হয়েছিল মাত্র। অত্যন্ত ভাঙাচোরা একটা রাষ্ট্রব্যবস্থার বোঝা নিয়ে, বাইরের দেশের প্রচণ্ড প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়তে চলছিল দেশটি।

সামান্য অর্থ সম্বল, অপর্যাপ্ত কলকারখানা পুঁজি করে সবাইকে নিয়ে একসাথে আকাশ ছোঁয়ার মহাযজ্ঞ লেখকের কলমে উঠে এসেছে অবিকলভাবে। এখানে লেখক ব্যক্তি, সমাজ থেকে রাষ্ট্রীয় অচলায়তনেরও পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন করেছেন। এমনকি তাঁর এই ভ্রমণে বিস্তরভাবে সমাজের সে সকল ব্যক্তির কথা তুলে ধরেছেন।

> 'সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে সকলের চেয়ে বেশি তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে- উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িতে পড়ে।'

শিকড়ে পৌঁছে তৃণমূলে থাকা এসকল মানুষকে জানার মাধ্যমে রাশিয়ার স্বরূপ জানার চেষ্টা এই ভ্রমণ কাহিনীকে করেছে অনন্য। নৈপুণ্যের সাথে লেখক তুলে ধরেছেন ক্লাবের ন্যায় কৃষি ভবনের কথা। এখানে কৃষকদের সাথে আলাপকালে লেখক জানতে পেরেছেন কৃষিতে বিপ্লব আনার জন্য শিক্ষাদানের কথা, কৃষকরা শহরে আসলে কৃষকদের থাকার ব্যবস্থার কথা, সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা গড়ে তুলতে তাদের আপ্রাণ চেষ্টার কথা। তিনি শুনেছেন অক্টোবর বিপ্লবের পর কিভাবে তারা যথার্থ স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েছেন, কিভাবে শিশু-বিদ্যালয় তাদের শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিত করছে। রন্ধ্রে প্রবেশ না করে ধমনীতে প্রবাহমান ধারাকে যেমন বোঝা যায় না, তেমনি তৃণমূলে থাকা এসকল মানুষকে না জেনে দেশকে জানার চেষ্টা বৃথা চেষ্টার নামান্তর মাত্র।

এই ভ্রমণকালে লেখক আরও বোঝার চেষ্টা করেছেন তাদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে। শিক্ষার জন্য সমস্ত আয়োজনে চিত্তের জাগরণ এবং আত্মমর্যাদার আনন্দকে তুলে ধরেছেন পাঠকদের জন্য। এই আয়োজন মুগ্ধ করেছে কবি মনকে, তাই এর তারিফ করার পাশাপাশি ভারতবর্ষের শিক্ষা ব্যবস্থার অসারতাকে তুলে ধরতে ধরতে দ্বিধা করেননি। কবির ভাষায়-

> "এখানে দেখলুম বেশ পাকা রকমের শিক্ষা, মানুষ করে তোলবার উপযুক্ত, নোট মুখস্ত করে এম এ পাস করবার মতন নয়।"

কবি শিক্ষা প্রণালী বোঝার চেষ্টা করছেন, কিন্তু সেটা রিপোর্ট বা বই পড়ে নয়। কিন্তু শিক্ষার চেহারা মানুষের মধ্যে

প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়ে লেখক স্বরূপ অনুসন্ধানের প্রয়াস পেয়েছেন। এই ব্যবস্থা যে বালক-বালিকাদের মধ্যে আত্মজাগরণ ঘটিয়ে নিজের সার্থকতার নিদর্শন রেখেছে সেই উল্লেখও কবি করেছেন শাস্তির বিধানের অনুপস্থিতির ঘটনার উল্লেখ করে।

এছাড়াও ভ্রমণকালে কবিগুরু নিজ মাতৃভূমির সাথে বার বার বিভিন্ন বিষয়ে রাশিয়ার তুলনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। ভারতে গৃহীত পদক্ষেপের আসারতা, সমাজ কাঠামোর দুর্বলতা তুলে ধরেছেন, রাশিয়ার প্রচলিত ব্যবস্থায় সাথে মেপেছেন একই নিক্তির পাল্লায়। অর্থাৎ লেখকের জন্য এই ভ্রমণ যতটুকু না ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক; তার চেয়ে অনেক বেশী আত্মার চিন্তার খোরাক যোগানোর ও মুক্ত বুদ্ধি বিকাশের নিয়ামক।

ভ্রমণের থেকে উৎসারিত জীবনবোধ আরও বেশি পরিলক্ষিত হয় 'জাপান যাত্রী' গ্রন্থে। কবি অবলোকন করেছেন জাপানিদের প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য। দেখিয়েছেন সর্বক্ষেত্রে তাদের সংযম যা পরিলক্ষিত হয় শুধু ব্যক্তি বা নাগরিক জীবনেই নয়, বরং সাহিত্যেও। তাদের সৌন্দর্যবোধ কবি-হৃদয়কে বিমোহিত করেছে এবং এই বোধের চর্চার প্রভাব করেছে মুগ্ধ। ব্যক্তি পর্যায়ে বোঝার মধ্য দিয়ে পুরো জাতির দর্শন বোঝার সার্থক প্রয়াস আমরা এখানেও প্রবলভাবে দেখতে পাই।

বিজ্ঞানের অগ্রযাত্রার সাথে সাথে পৃথিবীটা ছোট হয়ে এসেছে। ফা-হিয়েন কিংবা ইবনে বতুতা যতটা ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন ভ্রমণের জন্য, বর্তমান সময়ের পর্যটকদের তা করতে হয় না। ফলে, পর্যটকদের সংখ্যাও ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু আমরা যতটুকু না traveler তার চেয়ে অনেক বেশি tourist। ভ্রমণকালে ছবি তোলা, স্মৃতিস্মারক সংগ্রহের যতটা তাগিদ থাকে আমাদের, সেই জায়গার মানুষ, শিল্প, ইতিহাস, দর্শন কিংবা আটপৌরে জীবন নিয়ে জানতে ততটা তাগিদ থাকে না। আমরা জানতে চেষ্টা করি না তাদের দুঃখ বা আনন্দ কোথায়, পৌঁছাতে চাই না তাদের শিকড়ের কাছাকাছি। সর্বোপরি, আমাদের ভ্রমণ অনেক বেশি ইন্দ্রিয় তৃপ্তিদায়ক, কিন্তু অনুসন্ধিৎসু নয়। এসকল ভ্রমণের ফলাফল সামাজিক মাধ্যমে যতটা সরব, আমাদের মস্তিষ্কে ততটা নয়। অথচ কবিগুরুর এই দর্শন গ্রহণ করে আমরা আমাদের অন্তর্জগতকে সমৃদ্ধ করতে পারি বহুগুণে। তাই, ভ্রমণের মধ্য দিয়ে নিজেকে ও অপরকে জানতে বিশ্বকবির এই ভ্রমণদর্শন আমাদের পাথেয়।

লন্ডনে পড়তে গিয়ে আমার তিনটি বিপত্তি

প্রভাষক শাশীশ শামী কামাল
ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগ

১। ঠাণ্ডার মাঝে ঘুম থেকে ওঠা

লন্ডনে শীতের সময় দিনের বেলা তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস আর রাতের বেলা প্রায় ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস থাকে। সকালের দিকে ৪-৫ এর মাঝামাঝি থাকে। খুব ঠাণ্ডার ভেতর লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমানোর আনন্দ আলাদা। এরকম আনন্দ আল্লাহ আমাদের ফ্রি উপভোগ করার সুযোগ করে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা কয়জন এই সুযোগের সঠিক ব্যবহার করি? আমি এই নিয়ামত যথাসাধ্য উপভোগ করার চেষ্টা করতাম। কিন্তু সমস্যা হতো সোমবার আর বুধবার। এই দুইদিন আমার সকাল ৯ টায় ক্লাস থাকত। আমি ঘুম থেকে উঠে অ্যালার্ম অফ করে আবার ঘুমিয়ে শুয়ে পড়তাম লেপের ভেতর। অ্যালার্ম অফ করে ভাবি আর ৫ মিনিট ঘুমাব। কিন্তু দেখা যায়, ৪০ মিনিট ঘুমিয়ে ফেলেছি। তারপর কোনোমতে তাড়াহুড়া করে ক্লাসে যেতে হয়। আমার অবস্থা দেখে জার্মানির এক বন্ধু মনে করেছে আমার অ্যালার্ম ঘড়ি নেই। সে আমাকে বুদ্ধি দিল, মোবাইল ফোন ভাইব্রেশন মুড এ অ্যালার্ম দিয়ে একটা প্লেটের ওপর রাখতে আর সেই প্লেটেই একটা স্টিলের চামচ রাখতে। আমি কাজটি করেছি একদিন। প্লেট-চামচ এমনভাবে শব্দ করে কেঁপে উঠেছিল যে রীতিমত হার্ট-অ্যাটাক করার মত অবস্থা সৃষ্টি হয়। ক্লাস করার জন্য হার্ট-অ্যাটাক করে মরার কোনো মানে হয় না। এই আইডিয়া বাদ দিলাম। জার্মানদের ভেতর শিল্প নেই, খুবই যান্ত্রিক। আমি আরও হিউম্যানিস্ট অ্যাপ্রোচ নিলাম। চাইনিজ ফ্ল্যাটমেট ইউলিন খুবই লক্ষী টাইপের মেয়ে। সকাল বেলা উঠে নাস্তা বানায়, রান্না করে। তারপর ক্লাসে যায়। সোমবার তারও সকালে ৯টায় ক্লাস থাকে। তাকে বললাম দরজায় নক করে আমাকে যেন ঘুম থেকে উঠায়। সে খুব দায়িত্ব নিয়েই দরজায় জোরে জোরে বাড়ি মারে। আবার আমার ইটালিয়ান এক বন্ধু যে কিনা ৬ তলায় থাকে তাকে বলেছি বুধবার ক্লাসে যাওয়ার ৩০ মিনিট আগে আমাকে ফোন দিতে। সে ফোন দিয়ে আমাকে তাড়া দেয়। আর আমার বাংলাদেশী স্ত্রী তো আছেই ক্রমাগত ফোন দিয়ে ঘুম থেকে জাগানোর জন্য। আমাকে ঘুম থেকে উঠানোর জন্য যে আন্তঃদেশীয় সহযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে তা ভবিষ্যতে বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় বড় ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি। আসলে আমি অনেক কারণেই নোবেল পাই, তারা আমাকে দেয় না।

২। বৃষ্টির মাঝে ক্লাসে যাওয়া

আমি বৃষ্টি এমনিতে খুবই পছন্দ করি। তবে লন্ডনের সবচাইতে জঘন্য দিক হল এই বৃষ্টি। শীতের ভেতর বৃষ্টির কারণে চারিদিক স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে থাকে। ঝর ঝর মেঘের বাদল ধারা টাইপের অনুভূতি আসে না এই বৃষ্টিতে। কারও বাসার নিচ দিয়ে যাওয়ার সময় আপনার ওপর এক পসলা পানি পড়লে যেরকম লাগে- সেরকম একটা অনুভূতি হয়। তাও সমস্যা ছিল না। সমস্যা হলো বৃষ্টি কখন কিভাবে কোন সময়ে হানা দিবে বোঝা যায় না। ছাতা কেনার আগে একদিন ঘুম থেকে উঠে দেখি বৃষ্টি হচ্ছে। ক্লাস আছে একটু পর কিন্তু ছাতা নেই। বৃষ্টির মধ্যেই দোকানে যেয়ে ছাতা কিনে রুমে ফিরলাম। তখনো বৃষ্টি হচ্ছে। ক্লাসে যাওয়ার জন্য নিচে নেমে দেখি বৃষ্টি শেষ। রোদ উঠি উঠি করছে। বৃষ্টির ভেতর দিয়ে সাধারণ মানুষজন এমনভাবে চলাচল করে যেন কিছুই হয়নি। বৃষ্টির মতো এত বিশাল ঘটনাকে তারা তোয়াক্কাই করেনা। হাঁটছে, বৃষ্টি নামলে হঠাৎ স্যুট টাইয়ের ওপর রেইনকোট পরে আগের মত স্বাভাবিক গতিতে ভদ্রভাবে হাঁটতে থাকে। বাংলাদেশে বৃষ্টি আসলে আশেপাশের মানুষের মধ্যে একটা পাগলামি ভাব দেখা যায়। নারীপুরুষ বয়সভেদে দৌড়াদৌড়ি শুরু করে। অনেকে থমকে দাঁড়ায়। বৃষ্টিতে ভিজে একটু আনন্দ নেয়। অনেকে সরকারকে গালি দেয়। কিন্তু এদের ভেতর সেই পাগলামি ভাবটা নেই। এখানকার বৃষ্টিতে কাব্য ও আনন্দ নেই। দুঃখ, বিষাদ অথবা রাগও নেই। তারা এই পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে গেছে। এই অভ্যস্ততা খুবই বিরক্তিকর ও ভয়ের বিষয়।

৩। রান্না-বান্না করা

প্রথম প্রথম রান্না পারতাম না একদমই। সকালে নাস্তায় পান করতাম ফলমূলের জুস। রান্নাঘরের ব্লেণ্ডারে জুস বানিয়ে সেটা খেয়ে ক্লাসে যেতাম। প্রথম কিছুদিন ভাবতাম অনেক হেলদি খাবার খাচ্ছি। এভাবে খেতে থাকলে শুকিয়ে যাব। কিছুদিন পর এই জুস বিরক্ত লাগা শুরু করল। সেটা খাওয়ার চাইতে না খাওয়া ভাল মনে করলাম। তাই নাস্তা না করেই ক্লাসে যেতাম প্রায়ই।

দুপুরের খাবার নিয়ে চিন্তায় ছিলাম প্রথম দিন। কিন্তু রিযিকের মালিক আল্লাহ। ইস্কন এনজিও প্রতিদিন ইউনিভার্সিটিতে ফ্রি নিরামিষ খিচুড়ি বিতরণ করে। হরে কৃষ্ণা খিচুড়ি নামে পরিচিত এখানে। সবাই লাইন ধরে এই খিচুড়ি খায়। বেশ মজাই। প্রতিদিন খিচুড়ির মধ্যে ভ্যারিয়েশন আনার চেষ্টা করে। আমি লাইন ধরে যখন খাবার নেওয়ার জন্য যাই তখন সন্ন্যাসী টাইপের লোকটি আমাকে জিজ্ঞাস করে- You want some? আমি বলি- Yes, Please. সে বলে, You want some more? আমি বলি- Yes, Please. It would be very kind. তারপর সে জিজ্ঞাসা করে- You want some bread? আমি আবার বলি Yes, Please। এত সোশ্যাল ইন্টারঅ্যাকশান ভাল লাগে না। এটা খাবা? ওটা দিব? এত প্রশ্ন কিসের? যা আছে সব দিয়ে দিবে। যাই হোক, এভাবে দুপুরের খাবার শেষ করতাম।

রাতে খাবারের ব্যবস্থাও হয়ে গিয়েছিল। বাসার কাছাকাছি একদিন দেখি একটা ইন্ডিয়ান ভেজিটেরিয়ান রেস্টুরেন্ট। অল ইউ ক্যান ইট মানে বুফে টাইপ। সাথে ব্রিং ইয়র ওউন বটল। মানে নিজের মদ সঙ্গে আনুন-আমরা মদ বেচি না। রেস্টুরেন্টে ঢুকে মালিকের ও কর্মচারীর চেহারা দেখে বুঝলাম রেস্টুরেন্ট চালায় বাংলাদেশীরা। ধরে নিলাম সিলেটি হবে। কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম আর ইউ ফ্রম বাংলাদেশ? উত্তর দিল- আঙ্গো বাড়ি নোয়াখালী, আন্নের? অবশ্যই রিযিকের মালিক আল্লাহ। আমার বাড়িও নোয়াখালী। বেগমগঞ্জ। তাদের বাড়িও বেগমগঞ্জ। লন্ডনে নোয়াখালীবাসীর সংখ্যা খুবই কম। কিন্তু আমার ডরমিটরি থেকে ১০ মিনিটের দূরত্বে একজন ফেরেশতার মত ভাল মানুষ পেয়ে গেলাম। ফেরেশতার মত ভাল মানুষ কারণ সে আমাকে বলল টাকা লাগবে না- ফ্রি খেয়ে যেতে। একদিন ফ্রি খেলাম। খুবই সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর। পরেরদিনও ফ্রি খেতে বলল। আমি বললাম না ফ্রি খাব না, আমাকে ৫০% ডিসকাউন্ট দিতে। ডিসকাউন্ট দিলে প্রতিদিন খাব। তারা খুশিমনে রাজি হল। এরপর খুব কম খরচে রাতের খাবারটা সেরে ফেলতে পারতাম। এভাবেই খেয়ে দেয়ে বেঁচে থাকতাম। আমার ওজন ৮৯ কেজি থেকে ৮১ কেজি হয়ে গিয়েছিল। অনেক শুকিয়ে যাচ্ছি স্ত্রীকে ফোন করে এই করুণ কাহিনী বললাম- সে বলল, ভাল হয়েছে - এভাবেই চলুক (অথচ এই মেয়েকে ভালবেসে বিয়ে করেছিলাম)। কিন্তু রুটিন চলল না। ডেডলাইন, প্রেজেন্টেশন আসা শুরু করল। এই চাপের মধ্যে লতাপাতা ও ভেজিটেরিয়ান খাবার খেয়ে থাকা সম্ভব না। শুরু করলাম বার্গার, পিজা, ডোনার কাবাব, ডোনার মিল, যত ধরনের ফাস্ট ফুড আছে সব খাওয়া। সারাদিন ম্যাকডোনাল্ডস এ বসে অ্যাসাইনমেন্ট শেষ করেছি এমন সময়ও গিয়েছে। ভাল ছিল সময়টা। আমি আমার প্রিয় বিষয় নিয়ে লিখি। গান চলে নানা ধরনের। আর একটু পর পর খাবার আসে। খুবই আনন্দের। আমার ওজন আবার ৮৮ কেজি হয়ে যায়।

স্কটল্যান্ড ভ্রমণের সময় এক ভাইয়ের বাসায় কিছুদিন ছিলাম। সেখানে মুরগি রান্না শিখি। তারপর লন্ডনে ফিরে রান্না শুরু করি। ভাই বলেছিল ৬ পিস মুরগি তিন দিন যাবে। আমার ৬ পিস মুরগি লাঞ্চ আর ডিনারেই শেষ হয়ে যায়। রাঁধুনি মশলা মাখিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলেই মুরগি প্রস্তুত হয়। এই সহজ জিনিসটা নিয়ে শুধু শুধু ভয় পাচ্ছিলাম। এটা শেখার পর আমি সারাদিন মুরগি রান্না করতাম। আমার ফ্ল্যাটমেটরা আমি যে এই এক রেসিপি প্রতিদিন রাঁধি তা দেখে করুণা করত। তবে ফ্ল্যাটমেট ও কয়েকজন বন্ধুকে আমার রান্না খাইয়েছিলাম। তারা আমার রান্নার প্রশংসা করে। একজনকে অবশ্য ভুলে লবণ ছাড়াই রান্না পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। সেও আমার রান্না ভূয়সী প্রশংসা করে টেক্সট করেছিল। তাই তাদের প্রশংসার সততা নিয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

রান্না আমার মানসিক ভারসাম্য রক্ষার্থে অনেক বড় ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশে পড়তে এসে আমার মূল চ্যালেঞ্জ ছিল মানসিক ভারসাম্য ঠিক রাখা। তাই পড়ালেখার অনেক প্রেসার পড়লে মুরগি রান্না করতাম। একাকিত্ব বোধ করলে মুরগি রান্না করতাম। মন খারাপ থাকলে মুরগি রান্না করতাম। ক্ষুধা লাগলে মুরগি রান্না করতাম আর ক্ষুধা না লাগলেও মুরগি রান্না করতাম। সামান্য একটি মুরগি পাখি যে মানুষের এরকম পরম বন্ধু হতে পারে তা আগে জানা ছিল না।

Unrequited Love

Raufur Rahman
Dept. of BBA in Management Studies
Batch: 2020

She called me yesterday,
to look at her garden
She called me the day before,
to look at her pond.
And I went,
I went yesterday,
And I went the day before,
And I went all the times she ever called.
And I praised her work,
Her sophisticated practice,
Her elegant strokes on the leaves,
And when she throws a pebble in the water,
It makes the perfect circle of wave,
I praised that too.
And I praised her beauty,
her laughter, the sweetest sound in heaven,
her eyes, like pearls made of diamonds,
her hair, like it absorbs brightness,
I praised it all.
And yet, she did not call me today,
I waited, And she didn’t.
Maybe because, I don’t have a garden,
A pond, or anything of that kind.
Perpetual togetherness is not for us, I know
But still, if she calls me tomorrow,
I’m gonna go,
Because, when she is draped in the blue saree of hers,
and I look over her neck,
Even the sun seems like a full moon to me.

World of High Expectation

Md. Shariful Hasan Khan
Section Officer
Department of Finance & Banking

Whoever I am, whoever you are,
We live in a world of planets and stars,
A universe sewed by the needles of time.
With oceans to swim in and mountains to climb
Before I was born, this world was still there
I've welcomed my life with thanks and prayer
The world will go on after I die
I can't ever change that. So why should I cry?
Artists and writers can often seek fame
But fame by itself stirs a dangerous flame
All great obsessions can truly subtract
From the heavenly sense that keeps us on track
Whenever we love, whenever we hate
The wheels of life turn, creating our fate
An ancient truth carved in an elegant shrine
What's truly yours is there by design.
This world is a maze, ours to unravel
A pathway of light very well-travelled
We forego darkness, we try to be kind
Seeking a treasure that brings peace of mind
We seek more money with higher positions
Generals, Bankers or famed politicians
while all we need is for us to agree

that peace is our goal, compassion the key

Wherever I live, wherever I roam

I live on this planet, the Earth is my home

A place filled with love, but also with crime

A place you can choose your pathway in time

From hatred and fear, I prayed for release

I choose only love, the route towards peace

My world spins in the darkness of space

Joined to the power of infinite grace

We live in a world of great aspirations

We work and we play and find inspiration

Loving and living in this great creation

Shouldn’t that be our high expectation?

High Expectation, High Expectation.

Life

Md. Rakib Hasan Rabbi
Department of English, Batch: 2018

Look at the sky and think about the life

Where did you come from
And where will you go?
Who are you of this world

And what the world is to you?

Why you were born and why you will die?

Close both of your eyes and feel with your heart

Search in the deep of your soul

And taste one sip of your answer.

Be empty of worrying

Think why you were created.

Don’t hide yourself in prison

Binding yourself in thousand reason.

Ask your soul your question

Follow your heart for your answer.

Why every object and every being

Is a jar full of delight?

Why every of our surroundings

Act like counterfeit?

Why everybody have distracted talk,

Why religion have this much lock?

Why people makes lots of excuse

Why we carry burden that is huge?

Why some suffer much

Why some happy?
Why some die of hunger

Why some fatty?

Why does the poor people live at road

Why do they suffer from rain, hot and cold?

Why some have full of hatred

Why some have love,

Why some have plenty of relatives
Why some have none?

Everyone has eaten and fallen asleep

Is this the destination of our life?

Millions of questions

Here and there

OH, God.! I don’t know

I will go where.!

God smiled and replied back

Oh, dear soul

Life is all about, diamond and coal.

Pleasure, pain, ease, suffering

All are your mate,

One will come after another

To make change your fate.

দারিদ্র্যের সমাজবিজ্ঞান

মোঃ তানভীর মাহতাব
সমাজবিজ্ঞান বিভাগ, ব্যাচ-২০১৭

দারিদ্র্য একটি সামাজিক সমস্যা। কোন ব্যক্তি যদি তার মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করতে অক্ষম হয় তখন তাকে আমরা দরিদ্র বলি। এই ধারণার উপর ভিত্তি করে বিশ্বব্যাংক দারিদ্র্যসীমা নির্ধারণ করেছে যে, কোন ব্যক্তি যদি তার মৌলিক চাহিদা মেটাতে প্রতিদিন ১.৯০ মার্কিন ডলার ব্যয় করতে অসমর্থ হয় তাহলে তাকে দরিদ্র বলা যাবে। দারিদ্র্যের এই ধারণা মূলত অর্থনীতিবিদদের দেওয়া যারা দারিদ্র্যের পর্যবেক্ষণ, সংজ্ঞায়ন, বিশ্লেষণ করেছেন অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে এবং এর সমাধানও খুঁজেছেন সেভাবেই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট, প্রসঙ্গ, ক্ষেত্রবিশেষের ভিন্নতার বিবেচনায় দারিদ্র্যের উপলব্ধিতে রয়েছে ভিন্নতা। যেমন, অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে দারিদ্র্য হল অনাকাঙ্ক্ষিত, অনভিপ্রেত এবং অভিশাপস্বরূপ কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিতে দারিদ্র্য হল আশীর্বাদস্বরূপ। এর প্রতিফলন ঘটেছে বিদ্রোহী কবি নজরুলের কবিতায়ও। তিনি লিখেছেন,

হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে করেছ মহান

তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রিষ্টের সম্মান।

কণ্টক মুকুট শোভা দিয়াছ, তাপস,

অসঙ্কোচ প্রকাশের দুরন্ত সাহস।

এখানে নজরুল দারিদ্র্যকে দেখিয়েছেন আশীর্বাদরূপে এবং করেছেন মহিমান্বিত। কেননা এই দারিদ্র্য তাকে সাহস দিয়েছে দুঃখ, কষ্ট, যন্ত্রণাকে মোকাবেলা করতে এবং তা নিসঙ্কোচ হয়ে প্রকাশ করতে। আর যিশুখ্রিষ্টও দরিদ্র ছিলেন। তাই নজরুলের কাছে দারিদ্র্য আশীর্বাদস্বরূপ। একইভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও দারিদ্র্যকে দেখানো হয়েছে মহিমান্বিত করেই। বিভিন্ন প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে ইসলাম দারিদ্র্যকে প্রকাশ করেছে ধনাত্মক দৃষ্টিতে। কিছু হাদিস বিশ্লেষণ করলে এর স্বরুপ বোঝা যায়।

মহানবী (সাঃ) ইরশাদ করেছেন,"আমি বেহেশতের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখলাম যে, তার অধিবাসীদের অধিকাংশই গরীব মিসকিন"। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত আরেকটি হাদিসে রাসূল (সাঃ) বলেন,"গরীব মুহাজিররা কেয়ামত দিবসে ধনবানদের ৪০ বছর আগে বেহেশতে পৌছে যাবে"(মুসলিম)। আরেকটি হাদিসে দেখা গেছে রাসূল (সাঃ) বলছেন, "আমি তোমাদের দারিদ্র্য নিয়ে পেরেশানি করি না। আমার আশংকা তোমাদের ধনাঢ্যতা নিয়ে। কারণ, সম্পদের প্রবাহ শুরু হলে আর তোমরা এর পিছনে পড়ে যাবে। তারপর এই সম্পদ পূর্ববর্তীদের যেমন ধ্বংস করেছিল তেমনিভাবে তোমাদেরও ধ্বংস করে দিবে" (সহীহ মুসলিম)। এছাড়া ইসলামে যাকাত দেওয়া ও দান-সাদকার বিধানও আছে। এভাবে আরও অনেক হাদিসে উঠে এসেছে যেখানে ইসলাম ভোগ, বিলাসকে নিরুৎসাহিত করেছে এবং দারিদ্র্যকে করেছেন মহিমান্বিত ও আকাঙ্ক্ষিত। হিন্দু ধর্মেও আমরা একইভাবে দেখতে পাই যে, সেখানে বলা আছে ব্রক্ষ্মচর্য পালনের কথা। ব্রক্ষ্মচর্য অর্থ হল সংযম। সব ধরনের ভোগ, বিলাস থেকে নিজেকে সংযমিত রেখে খুব সাধারণ জীবনযাপনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সাধনা করা এবং নিজেকে কল্যাণকর পথে ধাবিত করা। আর এই ভোগ, বিলাসবিহীন জীবনকে বিবেচনা করা হয়েছে সর্বোচ্চ মর্যাদায়। হিন্দু শাস্ত্রে আরও বলা

আছে "দরিদ্রনারায়ণ" এর কথা যার অর্থ হল দরিদ্রজনকে নারায়ণের মত কল্পনা করা। বৌদ্ধ ধর্মেও একইভাবে দারিদ্র্যকে দেখা হয়েছে। বৌদ্ধ দর্শনে বলা আছে যে, দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে হলে এবং নির্বান লাভের জন্য বাসনাকে ত্যাগ করতে হবে। এছাড়াও বৌদ্ধ ধর্মে বলা আছে ভিক্ষুদের কথা। ভিক্ষু শব্দের মানে ভিক্ষুক, ভিক্ষান্নে জীবিকা নির্বাহ করে এমন ব্যক্তি। এই ভিক্ষুরাও ভোগ, বিলাসিতা ত্যাগ করে বিবাগী জীবনযাপন করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মেও ভোগ, বিলাসিতার চাইতে দারিদ্র্যকেই উচ্চ সম্মান দেওয়া হয়েছে কিন্তু অর্থনীতিবিদদের দৃষ্টিকোণ থেকে এটি নিছক বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। চীনে আবির্ভূত মহাপুরুষ কনফুসিয়াস দারিদ্র্যতাকে বলেছেন মানবসৃষ্ট সমস্যা এবং এই সমস্যার কারণ হল সমাজে সুশাসনের অভাব। তাই দারিদ্র্যের জন্য গরীবদের নয় বরং ধনীদের লজ্জিত হওয়া উচিত। অপরপক্ষে অর্থনীতিবিদ এডাম স্মিথ দারিদ্রতার জন্য দায়ী করেছেন মানুষের আলস্য এবং কর্মবিমুখতাকে। সুতরাং বুঝাই যাচ্ছে যে, ক্ষেত্রবিশেষের ভিন্নতার বিবেচনায় দারিদ্র্যের উপলব্ধিতে রয়েছে ভিন্নতা। এই সমস্যা থেকে পরিত্রানের জন্য সমাজবিজ্ঞানীরা বলছেন, দারিদ্র্যকে বুঝতে হবে দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট, প্রসঙ্গ, ক্ষেত্র বিবেচনা করে কেননা দরিদ্র্য হলো সাবজেক্টিভ এবং বহুমাত্রিক। ইংরেজিতে একটি প্রবাদ আছে "Beauty lies in the eyes of the beholder"। একইভাবে যে ব্যক্তির, যে সমাজের, যে দেশের দারিদ্র্য তাকে বুঝতে, প্রত্যক্ষ করতে, পরিমাপ করতে হবে সেভাবেই। টাউনসেন্ড এর মতে, আমরা যখন কারও কোনকিছু দেখে বঞ্চিত অনুভব করি সেটাই দারিদ্র্য। এবার তাহলে আমাদের সংস্কৃতি থেকে দারিদ্র্যকে দেখা যাক এবং উদাহরণস্বরূপ নারীর দারিদ্র্যকে বিবেচনা করা যাক। নারীর দারিদ্র্যের প্রসঙ্গ আসলেই আমরা সাধারণত নারীর শিক্ষায়, কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণ এবং নারীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতার কথা বলে থাকি কিন্তু প্রকৃতপক্ষে নারীর দারিদ্র্যের পেছনে প্রধানত দায়ী হল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। কিছু উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরও স্পষ্ট হয়। কোনো নারীর সন্তান নেই এমন নারীকে আমরা বলছি বন্ধ্যা, বাজা নারী। আবার কোনো নারীর স্বামী মারা গেছে, বিয়ে হয়নি অথবা করেনি এমন নারীদের আমরা বলি অভাগী, অলক্ষ্মী। সকল প্রকার শুভকাজে এদের দূরে সরিয়ে রাখি এবং প্রতি মূহুর্তে বঞ্চিত অনুভব করাই। এখানে তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা তেমন কোন বিবেচ্য বিষয় না। আবার এই সমাজ বিয়ের ক্ষেত্রে বলছে "বউ হতে হবে লাল টুকটুকে"। সুতরাং মেয়ের গায়ের রং যদি হয় কালো কিংবা শ্যামবর্ণ তা নিয়েও তাকে হতে হয় অবহেলিত। আর হরহামেশাই নারীকে তার চলাফেরা, পোশাক, চরিত্র নিয়ে, একটু রাত করে বাড়ি ফিরলেই নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় যেটা কখনই পুরুষের বেলায় হয় না। খারাপ চরিত্রের নারীকে বলছি "অসতী"। কিন্তু আশ্চর্যজনক যে বাংলা ভাষায় "অসতী" শব্দের কোন পুরুষবাচক শব্দ নেই। নারীর প্রতি এই অসমতার চিত্র ফুটে উঠেছে আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যতেও

"অধম অবলা জাতি

যদি থাকে একরাতি

পরের ভবনে কদাচিৎ

ছলধরে বন্ধুজন

লোকে করে গুঞ্জন

অবিচারে কৈলে অনুচিত।"

নারীর প্রতি এই অসমতার কারণ নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা নয় বরং পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা। আর পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় নারী হল গরীব এবং এই দারিদ্র্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বুঝা সম্ভব নয়। একইভাবে পুরুষের দারিদ্র্য, বিবাহিতের দারিদ্র্য, অবিবাহিতের দারিদ্র্য, বৃদ্ধের দারিদ্র্য, পথশিশুর দারিদ্র্য, শহরের দারিদ্র্য, গ্রামের দারিদ্র্যের মধ্যে রয়েছে বিস্তর পার্থক্য এবং যার দারিদ্র্য যেখানকার দারিদ্র্য তাকে বুঝতে ও পরিমাপ করতে হবে সেভাবেই। সমাজবিজ্ঞানীদের মতে, আধুনিক সমাজের দারিদ্র্য হল একটি রাজনৈতিক ধারণা এবং এই

দারিদ্র্যের কারণ হলো পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা। পুজিঁবাদের কাঠামোর ধরনটাই এমন যেখানে মালিকপক্ষ শ্রমিকদের শোষণ করবে এবং বিস্তর অসমতা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্যের সৃষ্টি করবে। আর রাজনৈতিক দলগুলো দারিদ্র্যের ব্যবহার করে ক্ষমতা দখল করবার হাতিয়ার হিসেবে। উদাহরণস্বরূপ নির্বাচন পূর্ববর্তী সময়ে দারিদ্র্যের পরিসংখ্যান নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে বিতর্কের কথা বলা যায়। আবার দারিদ্র্য বিমোচনের কথা বলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোতে তাদের আখড়া স্থাপন করে থাকে যার মাধ্যমে প্রকৃতপক্ষে সেই অনুন্নত দেশগুলোকে শোষণ করে থাকে। এসব সংস্থা দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বিভিন্ন অর্থ ও ঋণ সহায়তা দিয়ে থাকে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এদের উদ্দেশ্য হল তৃণমূল থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটান। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা রচিত "Assaulet on the poverty of the world" বইয়ের কথা বলা যায় যেখানে তিনি লিখেছেন, আমাদের অর্থ সাহায্য করার কারণ দারিদ্র্যতা যাতে ভয়ংকর রূপ না নেয়। দারিদ্র্য যখন চরমে পৌঁছায় তখন কমিউনিজমকে রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়ে। এসকল প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত দারিদ্র্য বিমোচনের নামে নতুন এক প্রকার শোষণ করার প্রক্রিয়া শুরু করেছে যার মাধ্যমে লাভবান হচ্ছে উন্নত বিশ্বের ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলোই। তাই সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন ও নিরসন করতে হলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অবসান আবশ্যক।

Pseudo-Activism: The Global Trend

Iftesham Iftekhar
Dept. of Business Administration General
Batch: 2020

There is a quote from Slavoj which goes:

The threat today is not passivity, but pseudo-activity, the urge to “be active”, to “participate”, to mask the Nothingness of what goes on. People intervene all the time, “doing something”; academics participate in meaningless “debates,” etc.; but the truly difficult thing is to step back, to withdraw from it all.

While looking for a proper definition, I came up with nothing that serves as a satisfying definition. The one that came close was from a paper written by Jonathan Bishop which states: Pseudo-activism is a type of group-think, social loafing, or free-riding, where people join organizations based around activism, but their intentions are based more around a kind of empathy, where it is more important to be part of a group that believes than be part of a movement that does[1].

This definition doesn’t fully explain what it entails. I’ve seen this too much among the “Social Media Generation” to not have a predisposed opinion about it. But that’s all this is. An opinion.

Pseudo-Activism is that fake unspoken necessity society creates, the necessity of participation. Anyone familiar with social media has been a victim of this at least once. Pseudo-activism doesn’t work in the sense that if you don’t participate, don’t opine on topics having no relevance to your life, the society will go against you. Although as I am saying this, the recent Ayman Sadiq incident rings the contradiction alarm in my head.

Anyways, this phenomenon is something a person builds in their minds. They feel they might get left out of the race towards social acceptance. Social Media trends are pseudo-activity in disguise. Someone doing a social challenge doesn’t mean we have to do it too. It also doesn’t mean that we can’t do it. But some of us inherently builds up this pressure that we must follow in those footsteps.

This is such a matter that one can’t call out others as a victim. The diagnosis of pseudo-activism must happen internally. Perspective makes this a very fickle disease to pinpoint as Pseudo-Activism can frequently turn to actual/real social engagement.

I’m going out on a limb here, calling it a disease. Because for me, it was exactly that. Life under quarantine made it more glaringly obvious for me.

Calling 2020 eventful would be an oversimplification. Starting from the ongoing pandemic, the BLM movement to the Pay Up protests of Bangladesh, we've seen too much in just 6 months. That too, with more time in our hands, less work to do and greater social engagement on the internet, the toll has been life-threatening for many.

Pseudo-activism made things worse. Anyone not speaking up publicly about worldly problems apparently doesn't deserve having a voice. While anyone speaking up is pretentious. Doing something for the community publicly is bragging and secretly helping out doesn't matter. Public support of global affairs is cool but doing the same for friends in their ventures is tainting social image.

Social media itself has become toxic and Pseudo-Activity is the injector of that poison. The rise of mental health problems shouldn't be surprising. People nowadays can't handle their family environments despite it being the only real, worldly, non-virtual connection they have.

For many, the escape from pseudo-activism is disengaging from it but doing that has become almost impossible as in current times almost everything is integrated in social media. And the environment here is such that it wrings out your opinion for the world to complement or criticize upon.

What we don't understand is that the people speaking up aren't the majority. We think whatever is being said on the internet is the peoples' opinion but that's not the case. Very few people speak up and push their opinions down others. Most of them are borderline extremists instead of activists.

It reached a point where recently I stumbled upon a post in which a clinically depressed person felt hesitant to open up seeing another post about depression because he couldn't relate to the problems stated there.

It's not something we can solve overnight. There might not even be a solution. Because pseudo-activity isn't the same for everyone. Some might loathe it while for others it might be an encouragement to become active and come out of their antisocial lives.

It is reducible to an extent. But only if people build up a perspective that is theirs and not based on other's preferences and then STICK to it.

With such a volatile demographic, anyone having a solid belief/perspective is the most controversial. Which brings me to my next point, we need to be more tolerable to what we see. We don't need to push someone or change ourselves to be socially accepted. Even if you do something grossly unacceptable, the people who truly care about you will remain the same. Even a murderer's parents will always love their son. We can't force or shame someone who doesn't agree with us. We don't have the right.

As for activism, things will be a lot simpler for you if you just be active in what YOU want. Do things that align with your intentions, not under social pressure. You want to post about your personal lives, do without hesitation. You want to contribute for the poor, do so because you want to. Not because your friends are doing it. Supporting a movement? Fantastic. But don't say something online and act the opposite in real life.

I too am guilty of Pseudo-Activism. I am not proud of it, but I acknowledge it because through this I came to this realization. I may not be fully immune to it, but I'll keep trying, that's for sure.

All this was just my opinion, things like these can't be generalized. So, hope you read it with an open mind.

[1] Bishop, Jonathan. (2014). My Click is My Bond: The Role of Contracts, Social Proof, and Gamification for Sysops to Reduce Pseudo-Activism and Internet Trolling. 10.4018/978–1–4666–5071–8.ch001.

নাফিসা

মেজর মোঃ এরশাদ মনসুর, ইবি
ডেপুটি রেজিস্ট্রার (এস্টেট)
চিফ প্লানিং, ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ওয়ার্কস

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে

ইন্দোনেশিয়ার ২২ বছর বয়সী এক তরুণী মাতা নাফিসার সংগ্রামী জীবনের কথা)

২০১৫ সালে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তা গিয়েছিলাম একটা সেমিনার করার জন্য। শুধু অংশগ্রহণ করা না, সেমিনার আয়োজনের সহায়তা প্রদানে অনেক দায়িত্ব ছিল সেখানে। আধা শতেক দেশের বোদ্ধারা এসেছিলেন সেই সেমিনারে। বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার উপর চার দিনের সেমিনার।

সে এক মহা আয়োজন!

সেমিনারটা হয়েছিলো পাঁচতারা হোটেল সুলতানে। এখানেই আমাদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো।

অনেক টাকা খরচ করে সে দেশের সরকার সেমিনার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অংশগ্রহণকারীদের জন্য ভ্রমণের ব্যবস্থা, খানাপিনা, উপহার সবকিছুর আয়োজন করেছিলেন।

জাকার্তা বেশ আকর্ষণীয় শহর। জায়গায় জায়গায় আধুনিকতার ছোঁয়া। জনসংখ্যার দিক দিয়ে পৃথিবীর বৃহত্তম মুসলিম দেশ হলেও মানুষের চলন বলন পোশাক-আশাকে জাকার্তার মানুষ অনেকটাই পশ্চিমা। পর্যটকদের ও বিদেশী অতিথিদের জন্য সবধরণের আয়োজন আছে এখানে। এখানে এসে ইন্দোনেশিয়া সম্বন্ধে আমার আগের ধারণাটা সম্পূর্ণ পালটে গেল।

নতুন কোনো জায়গা বা দেশে গিয়ে আমি যে কাজটার জন্য গিয়েছি সেটা নিয়েই শুধু ব্যস্ত থাকি না। অনেক কিছু জানার চেষ্টা করি। ইন্দোনেশিয়ায় চীনাদের বিশাল আধিপত্য এবং বিনিয়োগ।

এতক্ষণ যা বলেছি তা আমার গল্পের অংশ না। আমি ইন্দোনেশিয়ার একজন তরুণী মাতা নাফিসার সংগ্রামী জীবনের কথা বলার জন্য কলম ধরেছি।

নাফিসার বয়স ২২। এই বয়সে সে সাত বছরের একটি মেয়ের মা, স্বামীকে ত্যাগ করেছে, নিজের বাবা-মা, মেয়ে ও দুই ভাইয়ের সংসারের সব খরচ বহন করে।

শুনেছি ইন্দোনেশিয়ায় ১৭,৫০০ ছোট-বড় দ্বীপ আছে, যার প্রায় ৫০০০ দ্বীপে মানুষ বসবাস করে। সিংহভাগ দ্বীপে বাস করা মানুষ অনেক নিম্নমানের জীবনযাপন করে। প্রায় সব দ্বীপেই সুপেয় পানির অভাব বেশ প্রকট।

নাফিসার পরিবার যে দ্বীপে থাকে সেটি মোটামুটি উন্নত। ওর বাবা কৃষক। মা গৃহিণী। নাফিসার মেয়ে ওর বাবা-মা ও দুই ভাই এর সাথে থেকে গ্রামের স্কুলে পড়ে। বাড়িতে আর কেউ নেই। শহর থেকে কিছুটা দূরে নাফিসার গ্রাম। ছবির মত। আমাকে নাফিসা ওর পরিবারের সবার ছবি, গ্রামের ছবি, ওদের চাষের জমি, গ্রামের পাশের পাহাড়, ঝর্ণা, খোলা মাঠ, খাল, গাছ-গাছালি এবং ওদের বাড়ির ছবি দেখিয়েছে।

সেমিনারের পর আমি জাকার্তা বিমান বন্দরে গিয়ে সরাসরি বিখ্যাত বালি দ্বীপের প্লেন ধরি। যতটুকু মনে পড়ে বালি দ্বীপে পৌঁছাতে আমার ঘণ্টা খানেক সময় লাগে। নাফিসার সাথে আমার পরিচয় বালি দ্বীপে। বালি দ্বীপের বিমান বন্দরে নেমে আমি ওখানকার সবচেয়ে ভালো ও নিরাপদ একটা অবসাদ কেন্দ্রের পথে রওনা দেই। পথিমধ্যে বালির মানুষ, পর্যটক, উন্নত রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, গাছপালা, হরেক রকমের দোকানপাট এবং বিভিন্ন রকমের ভাস্কর্য দেখে বেশ পুলকিত হই।

বালি নিয়ে অনেক গল্প শুনে শুনে ইন্দোনেশিয়া এসে এখানটা না দেখে যাবো তা কি করে হয়। বিশেষ করে জঙ্গি হামলার পর এই দ্বীপটি দুনিয়ার অনেক মানুষের নজরে আসে। আগে হয়তো শুধু পর্যটকদের কাছেই বালি বেশি পরিচিত ছিল।

বিয়ের আগে নাফিসার সাথে ওর স্বামীর জানাশোনা এবং গভীর প্রেম-ভালবাসা ছিল। দুজন ইন্দোনেশিয়ার একটা দ্বীপের একি গ্রামে বাস করত। পরিবারের নিষেধ পরোয়া না করে নাফিসা নিজেকে প্রেম-ভালবাসার কাছে সঁপে দিয়ে ওর স্বামী হালিমকে গোপনে বিয়ে করে। একসময় ঝড় ঝাঁপটা শেষ হলে উভয় পরিবার ওদের বিয়েটা মেনে নেয়। দুজনের টোনাটুনির সংসার ভালই চলছিল। খুব স্বচ্ছলভাবে না হলেও ওরা ছিমছাম প্রকারে দিনাতিপাত করছিলো। একটা গাড়ির গ্যারেজে মেকানিক্স এর কাজ করে হালিমের যা আয় হতো তা দিয়ে দুজনের সংসারের খরচ চালানো খুব কঠিন হতো না।

দুজনের ভালবাসার গভীরতা চোখে পড়ার মতো ছিল। সব দিক দিয়েই দুজনে খুব সুখি ছিল। মানষিক, শারীরিক, আর্থিক, সামাজিক, পারিবারিক সব দিক দিয়ে ভালভাবে থেকে ওদের প্রতিটি দিন কাটছিল।

এক সময় নাফিসার কোল আলো করে এলো মেয়ে সুফিয়া। চাঁদের মতো সুন্দর। সন্তান প্রসবের পর নাফিসার শরীরটা একটু মুটিয়ে যায়। এতে হালিম ভিতরে ভিতরে হতাশায় ভুগতে শুরু করে। সম্পর্কের সমীকরণ নির্ধারণে ভালবাসা বা নাফিসার মন না, হালিমের কাছে নাফিসার শরীরটা যে প্রধান ছিল এটা ঘুণাক্ষরেও আগে টের পায়নি নাফিসা।

সন্তান প্রসবের পর হালিমের চলাফেরা, মতি-গতি, স্ত্রী ও কন্যার প্রতি দায়িত্ব গা ছাড়া পর্যায়ে গিয়ে ঠেকলো। প্রায়ই বাড়ি না ফেরা, সংসারের খরচ না দেওয়া, স্ত্রী- কন্যার খোঁজ-খবর না নেওয়া যেন হালিমের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

নাফিসার পক্ষে হালিমের হঠাৎ পরিবর্তন, অবহেলা সহজে মেনে নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। তারপরও সে স্বামীকে বুঝানো এবং স্বামীর মন ফিরে পাবার জন্য নিজের আগের লাবণ্য ও ছিমছাম দেহে ফিরে যাবার জন্য ডায়েট, ব্যায়াম করা শুরু করে। কিন্তু কিছুতেই সে স্বামীকে আর আগের মতো করে পাচ্ছিল না। সে যেন তার আগের হালিম না। সবসময় হালিম অন্যমনস্ক থাকে। হঠাৎ হালিম একেবারেই চুপচাপ হয়ে যায়।

অল্প কিছুদিনের মধ্যেই নাফিসার জীবনে যে বড় ধাক্কাটা এলো তার জন্য সে কখনই প্রস্তুত ছিল না। নাফিসার কানে এলো হালিম একি গ্রামের অন্য এক মেয়ের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে। এ খবরটা জানার পর সে আর ঠিক থাকতে পারেনি। সে বাড়িতে রাখা এক বোতল কীটনাশকের পুরোটা খেয়ে ফেলল। একবারও তার মনে আসেনি তার তিন মাসের মেয়ের কথা, বাবা-মার কথা, দুই ভাই এর কথা, তার প্রিয় গ্রামের কথা। এসেছিল হয়তো, কিন্তু সেই মায়া তার জীবনের এই বঞ্চনার চেয়ে শক্তিশালী ছিল বলে তার মনে হয়নি।

বালির মার্কেট, দোকান-পাট পৃথিবীর সব বিখ্যাত ব্র্যান্ডের জিনিসপত্র দিয়ে ভরা। খাবার দোকানগুলো পশ্চিমা বা ইউরোপিয়ো ধাঁচের। এখানে কেএফসি বা ইন্টারন্যাশনাল ফুড শপের অনেক চেইন আছে। বালিতে স্থানীয় মানুষ এবং সাধারণ পর্যটকদের জন্য কম দামের খাবারের দোকানও আছে। কম আয়ের স্থানীয় মানুষের কেনাকাটার জন্য এখানে আলাদা মার্কেটও আছে।

নাফিসার সাথে আমার পরিচয় হয় বালি দ্বীপের একটা অত্যাধুনিক মার্কেটে। তিন বছর যাবত নাফিসা একটা সুগন্ধির দোকানে ম্যানেজার-কাম সেলস গার্ল হিসেবে কাজ করে। সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ওর কর্মঘণ্টা।

বালি দ্বীপে আমার দ্বিতীয় দিনে কিছু কেনাকাটা এবং তারপর দুপুরের খাবার সেরে নেবার মনস্থির করে হোটেল থেকে বের হই। অনেক মার্কেট ও দোকান ঘুরে ঘুরে নাফিসার দোকানে এসে থামলাম।

দুপুরের এসময়টায় দোকানগুলোতে কেনাকাটার জন্য পর্যটকরা তেমন আসে না। নাফিসার দোকানে আমি যখন আসি তখন দুপুরের খাবারের সময়। নাফিসা ওর দোকানে একাই ছিল। ভিতরে ঢুকতেই দুগালে টোল পরা বিশাল এক হাসি দিয়ে নাফিসা ওর দোকানে আমাকে স্বাগত জানালো। আমিও প্রত্যুত্তরে একটু মুচকি হাসলাম। আমার চিরাচরিত পুরানো অভ্যাস অনুযায়ী সুগন্ধি দেখার ফাঁকে ফাঁকে নাফিসার সম্পর্কে জানার জন্য ওর সাথে আলাপ জমিয়ে ফেললাম। এটা অনেক মানুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি মৃদু আঘাতের পর্যায়ে পরে জেনেও নাফিসার প্রতিক্রিয়ার প্রতি খেয়াল রেখে ওর সাথে আলাপের গতি ও গভীরতা নিয়ন্ত্রণ করছিলাম।

বালি, ইন্দোনেশিয়া, বালি বম্বিং, এখানকার মানুষ, পর্যটন, ভাল খাওয়ার জায়গা সব কিছুর ব্যাপারে জানতে একের পর এক প্রশ্ন বানে নাফিসাকে জর্জরিত করে ফেললাম। মাঝে মাঝে আড়চোখে সতর্কতার সাথে নাফিসা বিরক্ত হয়ে যায় কি না সেটাও খেয়াল করছিলাম। একটুও বিরক্ত না হয়ে মায়াবি হাসিমুখে নাফিসা খুব আগ্রহের সাথে আমার সব প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছিল।

কিছু কিছু মানুষ আছে যারা কখনও বিরক্ত হয় না। এমনকি কঠিন সময়েও। নাফিসা তাদেরই একজন!

একসময় খেয়াল হলো দুপুরের খাবারের সময় গড়িয়ে যাচ্ছে। আমার ক্ষুধা ভাবটা একটু পর পর পেটের ভিতর থেকে চন চন তরঙ্গ ছড়িয়ে তীব্রতা জানান দিতে শুরু করলো। নাফিসাকে আমার সাথে খাবারের অনুরোধ করায় কিছুক্ষণ দোটানায় থেকে শেষে রাজি হলো।

দুপুরের খাবারের সময় নাফিসার সাথে অনেক গল্প হলো।

অনেক ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ও আজ এখানে দাঁড়িয়ে। স্বামীকে নিজ থেকে পরিত্যাগ করে এই বয়সে নাফিসা আজ স্বামীহারা। নাফিসা তার শেষ চেষ্টা করেছে স্বামীকে পথে আনতে কিন্তু একসময় নিরুপায় হয়ে সে স্বামীকে পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছে। চরিত্রহীন, অন্য নারীতে আসক্ত স্বামী থাকার চেয়ে না থাকা অনেক ভালো।

অল্প সময়ের পরিচয়ে নাফিসাকে আমার অনেক ভালো লেগেছে। একজন আদর্শ স্ত্রী, মা হবার জন্য কোনো নারীর যা যা গুণ থাকা প্রয়োজন, আমার মনে হয়েছে নাফিসা তার চেয়েও অনেক বেশি গুণে গুণান্বিত।

খুব সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলে নাফিসা। অত্যন্ত সরল ও বিনয়ী নাফিসা বেশ সুন্দরীও বটে। সন্ধায় ওর কাজ শেষে অন্য কোন কাজ না থাকলে একসাথে গল্প করা ও রাতের খাবারের প্রস্তাব দিলাম নাফিসাকে। আমার চোখের দিকে তাকিয়ে ওর মনের চোখ দিয়ে আমার ভিতরটা দেখে ও হয়তো আশ্বস্ত হল। নারীরা পুরুষের দৃষ্টি দেখেই বলে দিতে পারে সেখানে পাপ বা সরলতার ভাগ কতটুকু। বিদায় নেবার আগে সন্ধায় আমার হোটেলে আমার সাথে গল্প করতে এবং রাতের খাবার খেতে আসবে নিশ্চিত করে নাফিসা নিজের কাজের জায়গায় চলে গেল।

ইন্দোনেশিয়ার বালিতে আমি যে হোটেলটায় উঠেছি সেটা বেশ উন্নত মানের। এখানে সে দেশের বড় বড় লোকেরা অবসর কাটানোর জন্য আসেন। উপকূল সংলগ্ন ৫/৬ একর জায়গার উপর হোটেলটা তৈরি। আলাদা আলাদা এক বা দোতলার কটেজ, সুইমিং পুল, আলাদা আলাদা রেস্টুরেন্ট, জিম, বার, চোখ ধাঁধানো সুন্দর সুন্দর ল্যান্ড স্কেপিং, নাচের জায়গা এবং মন ভরে আনন্দ করার জন্য আরও অনেক আয়োজন আছে এখানে। হোটেলের ভিতরে গাড়িঘোড়া চালানোর কোনো সুযোগ নেই, কার্ট বা পায়ে হেঁটে যাতায়াত করতে হয় এখানে।

নাফিসা সন্ধ্যার আলো পরে যাবার পর আমার হোটেলে আসলো। আমি ওকে নিয়ে সুইমিংপুল এলাকা সংলগ্ন একটা ঝাউ গাছের পাশে বসলাম। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, গল্প করার জন্য মোক্ষম জায়গা। এখান থেকে লাল-কালচে

আকাশ এবং জাভা সাগর এর বিশাল জলরাশি বেশ ভালো দেখা যায়। এই হোটেলের উপকূল অংশে কোনো প্রাচীর নেই। পর্যটকরা যেন হোটেল থেকে সাগরের উপকূলে বা উপকূল সংলগ্ন রাস্তায় হাঁটার জন্য এখন-তখন বেরিয়ে পরতে পারেন তাই প্রাচীর দেওয়া হয়নি।

আড় চোখে নাফিসার দিকে তাকিয়ে দেখলাম ওর মুখে সেই মায়াবি হাসিটা লেগে আছে। আমার মতো একজন অপরিচিত পর্যটককে কি মনে করে একদিনের দেখা ও আলাপেই ওর খুব কাছের মনে হল এখনও বুঝতে পারি না।

নির্ভয়ে নাফিসা আমার সাথে আলাপ করতে, রাতের খাবার খেতে আমার হোটেলে এসেছে। প্রথমে দু'জনের জন্য হালকা নাস্তা ও ফলের জুসের অর্ডার করলাম।

খেতে খেতে অনেক গল্প হলো। নাফিসার জীবনের কথা, ওর সংগ্রামী জীবনের অনেক কথা। স্বামীর অন্য প্রেম ও দ্বিতীয় বিয়ে বন্ধ করার জন্য কীটনাশক খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা। তাতে কাজ না হওয়ায় নিজের হাত কেটে অনেক রক্ত ঝরিয়েও নাফিসা স্বামীকে ঘরমুখি করতে, স্ত্রী-কন্যামুখী করতে পারেনি।

পৃথিবীর অনেক নারীরা প্রতিনিয়ত এজাতীয় অন্যায়ে জর্জরিত। অনেকে এই অবহেলিত, ঘৃণার জীবন মেনে না নিতে পেরে আত্মহুতি দেন। অনেকে প্রতিবাদ করে নিজের পথ বেছে নেন। আর যারা দুর্বল, অসহায় তারা সেই বঞ্চনার জীবন মেনে নিয়ে আমৃত্যু বুকে পাথর বেঁধে করুণার পাত্র হয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দেন।

নাফিসা কড়া ধর্মীয় অনুশাসনে বড় হওয়া একটি রক্ষণশীল মুসলিম পরিবারের মেয়ে হয়ে স্বামীর চরম অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে স্বামীকে পরিত্যাগ করে ওর সমাজের অন্য মেয়েদের জন্য একটা সাহসী উদাহরণ সৃষ্টি করেছে কি না জানিনা! তবে, অবিশ্বাসী, বেইমান স্বামীকে পরিত্যাগ করে সমাজের একশ্রেণীর নোংরা পুরুষদের বিরুদ্ধে নাফিসা যে কঠিন প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর হয়ে থাকবে তাতে আমার কোন সন্দেহ নাই।

নাফিসা ইন্দোনেশিয়ার বালি দ্বীপের একটা দোকানে ম্যানেজার এর চাকুরী করার ফাঁকে ফাঁকে মেয়েদের পার্লারের কাজের প্রশিক্ষণ নেয়। নাফিসার স্বপ্ন একদিন সে নিজে একটা আধুনিক পার্লার করবে। ওর ধারণা নিজের গ্রাম থেকে দূরে শহরের কোনো একটা জায়গায় খুব সাজিয়ে গুজিয়ে একটা পার্লার খুললে বেশ ভাল চলবে। এজন্য সে একটু একটু করে টাকা জমানো শুরু করেছে।

গল্প করতে করতে অনেক রাত হয়ে গেল। দুজনে একসাথে রাতের খাবার খেলাম। একসময় বিদায়ের ক্ষণ ঘনিয়ে এলো। দুজনের চোখে হালকা জলের রেখা। দু'দেশের দুজন মানুষ, একজন পুরুষ একজন নারী। বয়সের অনেক ব্যবধান। একদিনের পরিচয়ে, আলাপচারিতায় অনেক কাছে আসা। নিজের জীবনের গল্প বলা। সেখানে কোন দূরত্ব নেই, নেই রাখঢাক, নেই সংকোচ, নেই চাওয়া-পাওয়া।

নাফিসাকে বিদায় দেয়ার আগে ওর স্বপ্নের পার্লারের জন্য ওর হাতে আগে থেকে ঠিক করা অনুদান তুলে দিলাম। ওর মুখে গভীর কৃতজ্ঞতার প্রকাশ লক্ষ্য করলাম।

ইন্দোনেশিয়া ছেড়ে আসার পর নাফিসা বেশ কয়েকদিন আমাকে খুদে বার্তা পাঠিয়েছে। অনেক মজার মজার কথায় ভরা বার্তা। ছবিও পাঠাতো নাফিসা। ওর স্বপ্নের কথা লিখে জানাত। নাফিসা ভাল আছে লিখে জানাত। আমাকে ওর গ্রামে যাবার জন্য প্রায়ই তাগাদা দিতো। একটা মিশ্র টান অনুভব করতাম নাফিসার জন্য।

অনেকদিন হল নাফিসার সাথে যোগাযোগ নেই। কিন্তু, কেমন করে জানি নাফিসা আমার মনে একটা জায়গা করে নিয়েছে। হয়তো একদিন নাফিসার সেই স্বপ্নের পার্লার বাস্তবে রূপ নিবে এবং আমি সেটা দেখতে যাবো। এই প্রত্যাশায় অপেক্ষায় থাকছি।

ভালো থেকো নাফিসা, অনেক ভালো। অনেক সুখি হও।

Lockdown

Shabab Junayed
Dept. of Finance and Banking, Batch: 2020

Lockdown is like a tunnel
that makes me wonder
why I've had to suffer?
Where did I lose my thunder?

Lockdown is like a tunnel
that makes me feel a fright
but leads to a massive sphere of light
and hope in swift flight.

Will there be a ray of light?
at the end of the tunnel
where happiness comes in bundles?

Can this prison be a scope?
Do you still think there's a hope?

Why So Judgemental?

Simeron Islam Nirjana
Dept. of English, Batch: 2015

Who is ugly? I thought everyone is beautiful!

A peaceful mind is beautiful!

A pure soul is beautiful!

A helpful person is beautiful!

A well-wisher is beautiful!

Then who is ugly where everyone is beautiful?

A cruel soul is ugly!

A dishonest person is ugly!

An ungrateful man is ugly!

An evil thought is ugly!

Being fair doesn't claim beauty,

Having beautiful eyes doesn't glorify beauty,

Getting the perfect features; doesn't hold beauty,

I can claim that very surely.

Not the one having snub nose is ugly!

Not the short one is ugly!

If you accept that the black one is ugly for sure;

Then your thoughts really need a cure.

The people calling you ugly for features; are fool!

Oh! Come on, dear! you are beautiful!

যান্ত্রিক জীবন ও আমরা

আনিকা মেহের আমিন
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং
ব্যাচ-২০১৯

বর্তমান পৃথিবীতে ক্রমশ প্রযুক্তিক হওয়ার দৌড়ে আমরা প্রতিদিন নিজেদেরকে একটু করে হারিয়ে ফেলছি। ফেসবুক, ইন্টারনেট ও স্মার্টফোনের এই আধুনিক জগতে নিজেদের আসল সুখটুকু কোথায় তা সমানে ভুলে চলেছি। ছেলেবেলায় বিদ্যুৎ চলে গেলে মনের আনন্দে নতুন নতুন খেলা বের করতাম। পাড়ার ছেলেমেয়েরা মিলে নিচে নেমে দৌড়াদৌড়ি করতাম, নয়তো বা ঘরে মোমবাতির নিভু নিভু আলোর সামনে হাত দিয়ে নানা রকম আকৃতি করে মজার মজার ছায়া তৈরি হতে দেখতাম। সেই আনন্দ এখন বিরক্তিতে পরিবর্তিত হয়েছে, কেউ রাগ হই টিভি দেখতে না পেরে, কেউ বা ইন্টারনেট ব্যবহার করতে না পেরে। এক সময় বন্ধুরা এক সাথে বসে হাতে এক কাপ চা নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আড্ডা দিতাম। এখন সবাই একসাথে বসে হাতের মুঠোফোনটার দিকে তাকিয়েই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যয় করে ফেলছি। সারা সপ্তাহ স্কুল করে শুক্রবার দিন সকালে উঠেই খবরের কাগজের সাথে দেওয়া ছোটদের ম্যাগাজিনটা খুঁজে সেটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছি, ভাই বোনরা মিলে তার মাঝে দেওয়া হাসির ছোটগল্প পড়ে হেসে পেটে খিল ধরিয়েছি। এখন সেই হাসি কোথাও শুনি না, ফেসবুকে পোস্ট দেখেই যা হাসি, তাই। মা খালাদের দেখতাম কোনো রান্না না জানলে দাদী নানীদের জিজ্ঞেস করতে, তাদের বাসায় গিয়ে নিজে দেখে বা সেই এক রান্না লেখার খাতাটায় জলদি করে টুকে নিতে। এখন মা হোক আর আমি হই, ইউটিউব থেকেই যাবতীয় সব রান্না শিখে নিই। এই অজুহাতে আর নানীর বাড়ি গিয়ে নানান রকম আঁচার খাওয়া আর আবদারটা কমেই গিয়েছে বটে। বাসায় চিনি লবণ কিংবা নিত্য প্রয়োজনীয় কিছু শেষ হলে নির্দ্বিধায় পাশের বাসার আন্টির কাছে থেকে নিয়ে এসেছি। মাঠে খেলতে খেলতে পিপাসা লাগলে কিছু না ভেবেই পাশের বিল্ডিং এর এক তালায় বেল বাজিয়ে বলেছি "একটু পানি হবে আন্টি?" মাঝে মাঝে পানির সাথে কপালে কিছু বিস্কুটও জুটতো। কিন্তু এখন পাশে ফ্ল্যাটের মানুষের সাথেই আনাগোনা কম, পাশের বিল্ডিং এ কে আছে তাও হয়ত জানি না, পানির বোতল সাথে করে গেলাম আর কিছু লাগলে চট করে কিনে আনলাম বা অর্ডার দিলাম মুঠোফোনটা দিয়ে। কিভাবে যেন এই যান্ত্রিক জীবনে এতই মেতে গেছি যে জীবনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুখগুলোর কথা ভুলে গেলাম? বড় হয়েছি বটে, তাই বলে কি এক বেলা আবদার করে মা-চাচিকে বলতে পারি না ভাতটা খাইয়ে দাও? কেন হাতের মেহেদির এতো সুক্ষ্ম নকশাই হতে হবে? গাছ থেকে কচি পাতা পেরে বা বাজার থেকে টাটকা মেহেদি পাতা কিনে বেটেও তো হাতে গোল করে দেওয়া যেতেই পারে। কলেজে অনুষ্ঠান, ভীষণ গরম, খুব ভারী মেকাপ আর রেশমের শাড়ি না পরে, সুতির শাড়ির সাথে হালকা কাজল ও টিপটা দেওয়া যেতেই পারে। বেনির সাথে কিছু বেলিফুলের মালা গেঁথে দিলে কিন্তু ভালোই মানাবে। ভালো মন্দ খেতে ইচ্ছে করলেই যে পিৎজা বার্গারই খেতে ইচ্ছে হবে তা কিন্তু আবশ্যক না, খিচুড়ির সাথে এক টুকরো ভাঁজা মাছ আর সাথে একটু আঁচার হলে কিন্তু মন্দ হয় না। অবশ্য, পিৎজা বার্গার খেতেও আপত্তি নেই। রবী ঠাকুরের নমনীয় গানের সুর আর নজরুলের প্রফুল্ল সংগীতে তাল দেওয়া যায়, হারমোনিয়াম নিয়ে বসে গলাটা সাধা যেতেই পারে। গ্রামের বাড়ি গেলে, দূরে শৌচাগারে যেতে ভয় লাগলে কাউকে খুব মানিয়ে সাথে নিয়ে যেতাম। কোথায় সেই ভয়, এখন গ্রামেও প্রায় সব ঘরের সাথেই বাথরুম। ঈদের দিন বাবা ভাইয়ারা নামাযে যাওয়ার আগে একটু সেমাই খেয়ে যাওয়া, তারা আসার আগেই আমাদের নতুন জামা পরে প্রস্তুত হওয়া। দুয়ারে হাজির হলেই দৌড়ে সালাম করা ও সালামি অর্জনটা এখনও আছে তো?

আমি অভিযোগ করছি না বর্তমান জীবনটিও মন্দ নয়। স্মৃতিবেদনার একটি চিত্র তুলে ধরছি কেবল। মুঠোফোন ও ইন্টারনেট এর প্রতি আমি অনেক কৃতজ্ঞও বটে। হয়তো আমার গুরুজনদের কাছে শৈশবের স্মৃতি এর চেয়ে ভিন্ন। হাতের মেহেদীর সুক্ষ্ম নকশাটাও ভালো লাগে, মেহেদি বাটা গোল করে আঙুলে দিতেও ভালো লাগে। পাশের বাসার আন্টির কাছে চিনি আনতে না গেলেও, নতুন খাবার বানিয়ে তার বাসায় নিয়ে যাই খাওয়াতে বাটিটা কিন্তু কখনো খালি ফেরত আসে না প্রতিবেশীর বহু বছরের সৌজন্যটা এখনও অনেকেই ধরে রেখেছে বটে। রেশমি শাড়ি পরে মনের মতো সাজ দিয়ে নিজেকে যেমন ভালো লেগেছে, হঠাৎ সুতির শাড়িটার সাথে কাজল আর কালো টিপ দিয়েও নিজেকে ভালো লেগেছে। মুঠোফোনটা সাথে থাকলেও, এখনও বন্ধুদের সাথে জম্পেশ আড্ডাটা হতেও দেখেছি, কারো হাতে চায়ের কাপ তো কারো হাতে কফি আর গিটার। ইউটিউব থেকে বিদেশি রান্না শিখেছি বটে, তার সাথে ছেলেবেলায় দাদির হাতে খাওয়া ভুলে যাওয়া পিঠাটা বানানোও শিখে দাদিকে চমকে দিয়েছি। মন খারাপ হলে সপ্তাহের সেই ম্যাগাজিনটা পরেও হেসেছি, ফেসবুকে হাসির ভিডিও দেখেও হেসেছি। রোজ রোজ হারমোনিয়ামটা না ধরলেও, ছোটবেলায় শিখা সেই একটি গান এখনো বাজাতে পারি। রক গানের পাশাপাশি বন্ধুরা মিলে গিটারে সেই রবী ঠাকুরের গানটাও বাজিয়ে গেয়েছি। গ্রামে বাথরুমে যেতে আর ভয় না করলেও, রাতে ভয়ের সিনেমা দেখে কোথাও একা থাকার ভীতিটা থেকে গিয়েছে ও তার মধ্যে এক রকম রোমাঞ্চ অনুভব করাটাও পেয়েছি। এখনও চেষ্টা করি বাবার, ভাইয়ার থেকে সালামিটা ঠিকই আদায় করার। চিরাচরিত দুধ-সেমাই না বানালেও, নতুন পদের নবাবি সেমাই, ভাঁজা সেমাইটা ঠিকই বানিয়েছি। আগের মত নির্বিঘ্ন অবকাশের দিন হয়তো নেই, কিন্তু এই একঘেয়েমি ও কর্মব্যস্ত জীবনের মাঝে সপ্তাহ শেষে অবসরের অপেক্ষার মাঝেও এক রকম আনন্দ খুঁজে পেয়েছি।

ছেলেবেলার অনেক মধুর স্মৃতি হয়তো ফেলে এসেছি, সোনালি দিনগুলো পিছে রেখে এসেছি। তাতে আমরা বিদ্যমান দিনগুলোকে সাদামাটা করে ফেলিনি, যান্ত্রিক জীবনটার সাথে খাপ খাইয়েই পরম্পরা ধরে রাখার চেষ্টা করেছি, শৈশবের মধুর স্মৃতির ছোঁয়াগুলো খুঁজে বের করেছি। নব্বই দশকের সব চলন হয়তো মনেও নেই, স্মৃতিতে যতটুকু আসে তার মর্ম বুঝে মনে রেখে দিতে চেয়েছি। দৈনন্দিন জীবনের নিন্দা করবো না, এখনো ভালোই আছি আমরা। হয়তো এই স্মৃতিগুলোই একদিন আমরা মনে করে অতীত-আর্তি করব। মন চাইলেই আমরা জীবনটার মধ্যে সেই সোনালী দিনের আভাস ধরে রাখতে পারি। স্মৃতির সেই বিনিসুতোর মালার তো সমাপ্তি হয়নি এখন, এখনই গিটটা না দেই। যতদিন পারি, অধিষ্ঠিত দিনগুলোকেই না হয় সেই সোনালী রঙে রাঙিয়ে তুলি, তা আমাদের বয়স যাই হোক না কেন।

জাপানের স্বাস্থ্যসেবা আধুনিক বিশ্বে অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত

মুহাম্মাদ কাউছার মাহমুদ
শাখা কর্মকর্তা, পাবলিক রিলেশন
ইনফরমেশন অ্যান্ড পাবলিকেশন্স

সুস্বাস্থ্যের অধিকারী মানুষ ছাড়া উন্নত জাতি গঠন করা সম্ভব নয়। সুস্বাস্থ্যই পারে একটি কর্মঠ ও উন্নত জাতি গড়ে তুলতে। কিন্তু সঠিক স্বাস্থ্যসেবার অভাবে প্রতি বছর বিশ্বের বহু দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাচ্ছে। তবে জাপানের স্বাস্থ্যব্যবস্থার সুখ্যাতি সারা বিশ্বে পরিচিত। স্বাস্থ্যসেবা প্রদানে জাপান ইতোমধ্যে সফলতার সাক্ষর রেখেছে যার কারণে এটিকে বিশ্বের সেরা স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থার একটি বলে বিবেচনা করা হয়। ১৯৪৫ সালে যেখানে জাপানে নাগরিকদের প্রত্যাশিত গড় আয়ু ছিলো ৫২ বছর, যা বর্তমানে প্রায় ৯০ এর কাছাকাছি এবং বিশ্বের সর্বোচ্চ। বিভিন্ন সময়োপযোগী পদক্ষেপের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবাকে মানুষের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দিয়েছে যেমন সার্বজনীন বীমা কাভারেজ তৈরি, চিকিৎসার সরঞ্জামাদি ও চিকিৎসার ব্যয় কেন্দ্রীয়ভাবে ফি নির্ধারণ, চিকিৎসা খরচ পরিশোধের কো-পেমেন্ট পদ্ধতি প্রচলন, বিশেষজ্ঞ ডাক্তারগণ টেলিফোনের মাধ্যমে সেবা প্রদান, জরুরি স্বাস্থ্যসেবা প্রদান ইত্যাদি। তবে জাপান ১৯২২ সাল থেকে তাদের চিকিৎসা সেবার বিভিন্ন সময়োপযোগী সংস্কার করে আসছে ফলে ক্রমান্বয়ে তা চিকিৎসাবান্ধব একটা চিকিৎসা সেবা হিসেবে বিবেচিত হয়।

জাপান ১৯৬১ সালে সার্বজনীন স্বাস্থ্যবীমা ব্যবস্থা চালু করে যা স্বাস্থ্যসেবায় সকলের জন্য অভূতপূর্ব সাফল্যের দ্বার উন্মোচন করে দেয়। প্রত্যেক নাগরিক স্বাস্থ্যবীমার অধীনে এসে স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণ করে এতে সুবিধা হলো রোগীরা একটা অংশ প্রদান করে আর বাকী অংশ বীমা কোম্পানি পরিশোধ করে। জাপানে বিভিন্ন ধরনের বীমা স্কিম চলমান এবং প্রতিটার আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। National Health Insurance হলো একটি কমিউনিটি-ভিত্তিক স্বাস্থ্য বীমা ব্যবস্থা। বেকার, অবসরপ্রাপ্ত তবে ৭৫ বছর বয়সের নিচে, ছাত্র, কৃষি শ্রমিক বা স্ব উদ্যোগ শ্রম, ফ্রিল্যান্সার, সেই সমস্ত কোম্পানির কর্মচারী যেখানে ৫ জনের কম কাজ করে এবং তাদের উপর নির্ভরশীল এই সব ব্যক্তিরাও এই জাতীয় স্বাস্থ্যবীমার অন্তর্ভূক্ত হবে। বীমাকৃত ব্যক্তি বীমা কার্ড নিয়ে স্বাস্থ্যসেবা নিতে যাবে এবং নিজের ইচ্ছায় যে কোনো ডাক্তার অথবা হাসপাতালে সেবা গ্রহণ করবে। Society-Managed Health Insurance হলো সমাজ-পরিচালিত স্বাস্থ্য বীমা বৃহৎ কর্পোরেশনের কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য যেখানে ৭০০ এর অধিক শ্রমিক কাজ করে। একটি বৃহৎ সংস্থা স্বাস্থ্যবীমা আইনের অধীনে তার নিজস্ব স্বাস্থ্যবীমা কর্মসূচি স্থাপন ও পরিচালনা করতে একটি বীমা সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারে। এই বীমাগুলো সরকারি নিয়মের মধ্যে কাজ করবে। জাপানের ২৪ শতাংশ মানুষ এই বীমাভুক্ত। Government Managed Health Insurance হলো সরকার পরিচালিত স্বাস্থ্য বীমা একটি সরকার পরিচালিত প্রোগ্রাম যা ছোট এবং মাঝারি আকারের সংস্থাগুলোর জন্য। যেখানে পাঁচ থেকে সাতশ এর মধ্যে শ্রমিক কাজ করে। Mutual Aid Associations হলো সিভিল অফিসার ও শিক্ষকগণ এর জন্য বীমা পদ্ধতি। Seamen's Insurance System হলো সমুদ্রগামী নাবিকরা

এ শ্রেণির অন্তর্ভূক্ত হবে। অসুস্থতা, আঘাত, শিশু জন্ম, নাবিকদের মৃত্যুর কারণে তাদের উপর নির্ভরশীলরাও এই বীমার সেবা পেয়ে থাকে।

তবে বয়স্ক ব্যক্তিদের জন্য উপযোগী দীর্ঘ মেয়াদী স্বাস্থ্যসেবা বীমা (Long-Term Care Insurance) পদ্ধতি ২০০০ সালে থেকে চালু রয়েছে। এর মাধ্যমে বাড়িতে নিবিড় সেবা, পরিচর্যা, দৈনিক বিভিন্ন সেবাসমূহ প্রদান করে থাকে যেমন গৃহে গিয়ে সেবা প্রদান, পরিচর্যা, বয়স্কদের গোসল করানো, বাসগৃহের অভ্যন্তরে বিভিন্ন মেয়াদী যত্নসহ নানা ধরনের সেবা প্রদান, স্মৃতিভ্রংশ মানুষের জন্য সেবা প্রদান ইত্যাদি। জাপানে ক্রমান্বয়ে বয়স্ক মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। ২০০০ সালে ৬৫ বছর বা তার বেশি বয়স্ক মানুষের সংখ্যা ছিলো মোট জনসংখ্যার ১৭.৪ শতাংশ যা ২০১৫ সালে ২৬.৭ শতাংশ হবে। এছাড়া এটাও বলা হচ্ছে যে ২০৫৫ সালে এই সংখ্যা হতে পারে ৩৯.৪ শতাংশ । জাপানে জাতীয় ফি সিডিউল পদ্ধতি রয়েছে যা জাপানের সকল নাগরিকের জন্য প্রযোজ্য, কেন্দ্রীয়ভাবে মূল্য নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। এটি এমন এক ধরনের পদ্ধতি যা কেন্দ্রীয়ভাবে চিকিৎসা সংক্রান্ত সকল জিনিসের মূল্য নির্ধারণ করে। ফি সিডিউল জাপানি মেডিক্যাল পদ্ধতিকে আরো ফলপ্রসূ করেছে। ফলে এতে কারো বঞ্চিত হওয়ার সুযোগ থাকে না। জাতীয় ফি সিডিউল দুই বছর অন্তর সংস্কার করা হয় এবং অনেক দিক বিবেচনা করতে হয় যেন জনগণ সেটা সহজে গ্রহণ করতে পারে।

জাপান মাতৃ স্বাস্থ্য ও শিশু মৃত্যুহার কমাতে বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করেছে এবং তা ফলপ্রসূ হয়েছে। Maternal and Child Health Handbook in Japan নামে একটা বই বিতরণ করে যেখানে স্বাস্থ্যবিধির বিভিন্ন তথ্য রয়েছে। এই বই প্রথম ১৯৪৭ সালে প্রথম প্রকাশ পায়। এখানে মা এবং শিশুদের স্বাস্থ্যের উন্নয়নে পরিবারের করণীয় সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। প্রথমে বইটি ২০ পৃষ্ঠার ছিলো কিন্তু বর্তমানে তা ৪৯ পৃষ্ঠা। গর্ভাবস্থায় দায়িত্ব, শিশুর প্রতিপালনের দিকনির্দেশনা, মা ও শিশুর তথ্য সংরক্ষণসহ বিভিন্ন তথ্য বিদ্যমান থাকে। জাপান ইতোমধ্যে মাতৃস্বাস্থ্যের ঝুঁকি হ্রাস, শিশু মৃত্যুহার কমাতে সফল হয়েছে। সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফি সিডিউল অনুযায়ী স্বাস্থ্যবীমা কোম্পানিগুলো বিভিন্ন স্কীমের আওতায় শিশুর জন্মকালীন, শিশুর যত্ন ভাতা বাবদ বেশ কয়েক ধরনের আর্থিক সুবিধা দিয়ে থাকে।

স্বাস্থ্যসেবায় জাপান ভাগাভাগি (Copayment) পদ্ধতি অনুসরণ করে যেখানে বীমাকৃত ব্যক্তি ও স্বাস্থ্যবীমাগুলো নির্দিষ্ট হারে চিকিৎসা খরচ বাবদ পরিশোধ করে থাকে। প্রাক স্কুল শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে ২০% রোগীরা নিজে আর বাকী ৮০% বীমার মাধ্যমে, স্কুলগামী শিশু থেকে ৬৯ বছর বয়স্ক সদস্যরা ৩০% রোগী নিজে আর বাকী ৩০% বীমার মাধ্যমে এবং ৭০-৭৪ বছর বয়স্কদের জন্য রোগী নিজে ১০% আর বাকী ৯০% বীমার মাধ্যমে পরিশোধিত হয়ে থাকে। প্রতি মাসে Social Insurance Medical Fee Payment Fund এবং National Health Insurance Federation এর আঞ্চলিক অফিসে বিল জমা দেওয়া হয়। অতিরিক্ত চার্জ নেওয়া হচ্ছে কিনা, বিল করার ক্ষেত্রে কোনো গড়মিল আছে কিনা ইত্যাদি আর্থিক বিষয়গুলো উক্ত প্রতিষ্ঠান দুটি তদারকি করে। বিলগুলো প্রতিষ্ঠান দুটি থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর ব্যক্তি তহবিল থেকে হাসপাতাল ও চিকিৎসকের কাছে পৌঁছে যায়।

জাপানে চিকিৎসা সম্পর্কিত মামলা, দেরি করা, বীমাগত সমস্যা ইত্যাদি সমস্যাগুলো দ্রুত সমাধান করতে কিছু অ্যাটর্নি নিয়োগ করে যারা দ্রুত সমাধানে সাহায্য তবে এই সব সমস্যা স্বল্প পরিসরে ঘটে। হাসপাতালে কিংবা চিকিৎসা সেবা সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানে কোনো রকমের হয়রানির শিকার বা কোন ধরনের অনিয়ম পরিলক্ষিত হলে তা প্রতিরোধে জাপান সরকার শাস্তির বিধান রেখেছে। জাপানে বহু আন্তর্জাতিকমানের হাসপাতাল রয়েছে যেমন

ন্যাশনাল হাসপাতাল অরগানাইজেশন, ন্যাশনাল ক্যান্সার সেন্টার হাসপাতাল ইত্যাদি। জাপানে ২৮টি হাসপাতাল বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। বিদেশিরা যাতে সঠিক সেবা পেয়ে থাকে তার জন্য ইংরেজি ভাষা চালু রয়েছে। জাপানে বিরাজমান স্বাস্থ্যসেবার আওতায় বিদেশিরা ভ্রমণকালে কিংবা কর্মরত অবস্থায় স্বাস্থ্য সুরক্ষার নিশ্চয়তা পেয়ে থাকে। তারাও স্বাস্থ্যবীমার অধীনে এসে চিকিৎসা নিতে পারে। এছাড়া সেসকল ব্যক্তি যারা জাপানিজ না তবে কমপক্ষে তিন মাস বা তার বেশি সময় ধরে বসবাস করছে, তারাও এই বীমার অধীনে এসে সেবা গ্রহণ করতে পারবে।

নিরাপদ পানি সরবরাহে ও স্যানিটেশনে জাপান উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। পানি বিতরণকালীন সময়ে জাপানের বিশ্বে সবচেয়ে কম পানি অপচয় হয়। পানিবাহিত অনেক রোগে সেখানে বহু লোক মারা যেত কিন্তু বর্তমানে আধুনিক পানি সরবরাহ ব্যবস্থার মাধ্যমে তা কমাতে সক্ষম হয়েছে। জাপানের ৯৭ ভাগেরও বেশি লোক ট্যাপের পানি ব্যবহার করে। পানি সরবরাহে কোথাও যদি ফুটো দৃশ্যমান হলে তবে তাৎক্ষণিক সেখানে সংস্কার করা হয়। এভাবে জাপানি নিরাপদ পানি সরবরাহ নিশ্চিত করছে।

এছাড়া শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিরা বেশি স্বাস্থ্যঝুঁকিতে থাকেন। তাদের জন্য সাধারণ স্বাস্থ্যসেবার পাশাপাশি অতিরিক্ত যত্নবান হওয়া প্রয়োজন। শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিদের জন্য জাপান সরকার সাহায্যকারী সঙ্গী হিসেবে কুকুরকে ব্যবহার করার প্রচলন করেছে। হাসপাতালে যাওয়া, ডিপার্টমেন্ট স্টোরে যাওয়া অথবা ট্যাক্সি পেতে কুকুর সাহায্য করে থাকে। এছাড়া অন্ধ ও বধির ব্যক্তিদের পথ চলতে এবং দৈনন্দিন কার্যক্রম সম্পাদনে সাহায্য করে। সাহায্যকারী কুকুরগুলো প্রশিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে থাকে। সাহায্যকারী কুকুরগুলোকে এমনভাবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে যে তারা নির্দেশকের নির্দেশানুযায়ী সাহায্য করতে পারে। এধরনের উদ্যোগ শারীরিক অক্ষম ব্যক্তিদের দৈনন্দিন জীবনযাপনের প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে দূর করে।

Reference:

https://www.mhlw.go.jp/english/

Mahmud, M. (2020) Analyzing the Health Security System in Japan: Lessons Learned for Bangladesh. Open Access Library Journal, 7, 1-13. doi: 10.4236/oalib.1106227.

অমানুষ

আলী মর্তুজা
ডিপার্টমেন্ট অব আইসিটি, ব্যাচ-২০১৯

আচ্ছা! তুমিই তো মানুষ,
হৃদস্পন্দন কি তোমার সত্য?
নাকি রক্ত তোমার মিথ্যে,
নাকি বিবেকটাই তোমার বিকলাঙ্গ!
যদিও তুমি শ্রেষ্ঠ জীব
ভদ্র সমাজে বড়ই সুশীল,
মুখোশের আড়ালে আত্মাটায়
না জানি কত রক্তের মাখামাখি।
তুমি সুদর্শন, অপূর্ব রূপ
ধর্মের পোশাকে তুমিই মহান,
তোমার ওই হাসির আড়ালে
কে জানে কত নারী কান্না খোঁজে।
মিথ্যে কি ছিল তবে নারীর জন্ম?
ভুল ছিল তবে তাঁর আঁকা যত স্বপ্ন
নাকি ভুল ছিল তোমারই জন্ম!
তোমার শত দিনের মিথ্যে গল্প।
আঁধারে আলো খুঁজে যখন অজস্র নারী
কারো অপেক্ষায় আবার আঁধারের জয়ধ্বনি,
এ কেমন সংসার, যেখানে নেই সংস্কার?
নেই স্রষ্টার রূপের প্রতি কোনো কুর্ণিশ।
তুমি আজ অভিশপ্ত চির ভণ্ড
উল্লাসের পাষাণ চিৎকার ধ্বনিতে,
তুমি রোজ কেঁড়ে নাও কত নারীর মান
যেনো তুমি নোংরা নর্দমার এক কীট।

*** বি:দ্র: কবিতাটি নারীর প্রতি সহিংসতার প্রতিবাদে লেখা।*

Stained Hearts

Tasnim Rahman
Department of Economics, Batch: 2019

There's a dirt stain on Saba's salwar. The smudged black and brown streak snaked around her calf like a scar from an untended wound. Even the frilly white fabric of her salwar was imperfect. Good thing her legs were under the table.

Saba felt a need to hide the stain anyway. She crossed her legs under the table, the rest of her body following the measured movement and turning her stiff like a stone-carved sculpture. Considering how her heart had already turned to stone and refused to beat inside her chest, she wasn't surprised. But the people across her on the other end of the small diner table would be concerned soon. She uncrossed her legs.

The need to hide kept gnawing at her conscience like an unexplainable itch. She crossed her legs again, remembered the guests, and uncrossed her legs. She crossed them again. Her body fell into a repetitive rhythm of familiarity in this diner filled with strangers. Her heart found a little comfort but was still fighting against her ribs closing in. The fight for air reminded her of the first months with Kiran when her heart would freeze and the world would spin when she was around him.

Kiran didn't set the butterflies in her stomach free anymore. That's what had drawn Saba into him. The comfort. The predictability. The swift lines with no ups and downs. But now Kiran seemed like the roughest terrain she'd had to cross until today. In his neatly ironed white button-down tucked in his black slacks, he was a stranger to Saba. The stress lines on his cheeks from biting the inside of his mouth too hard were still familiar but Saba found no solace.

"Our decision is final," Kiran's father said with a playful wink at his son.

"I am glad both parties have made the right decision for our children," Saba's father said. His lips spread into an ear to ear grin.

The two men in charge got up from their seats and shook their hands like this was a business deal. She'd seen her father make numerous business deals before, but nothing had made him this happy.

Between Kiran and herself, she wondered, which one of them was the commodity and which one the currency.

"What a beautiful news! This requires sweets," her mother declared as if she could hear Saba's thoughts. The right blend of soft and stern in her voice soothed Saba. The thought of signing contracts with Kiran the next morning left her nauseated anyway.

"We need to celebrate our families merging together," Kiran's mother added. Her smile matched the enthusiasm in her voice.

If things were falling in line, why did it hurt so much?

Saba had never felt so distant from her own family than she did now, on the day that she was becoming a part of a new family. The series of deceitful words from her mother and Kiran from the past few weeks now circled like vultures in her head, waiting to feed on the remains of her dissipating heart. They had said she wouldn't have to leave one family to join another. It sounded like a lie now.

She searched for Kiran's legs under the table, craving those possibly-false promises again. The tip of her high-heel clad feet brushed on a worn canvas shoe instead of the polished oxford shoes she was reaching for. The foot retracted in reflex, and sprung back immediately hitting her shin.

Saba bit her tongue and held on to the smile she'd been perfecting the entire evening. She looked at Sharif, the owner of those canvas pair. He'd been kicking her periodically all evening. No wonder her salwar was stained with dirt from his shoes. Maybe her brother was responding to the last call to enjoy the annoyance in her face before she left. The thought of it was enough to melt the fiery glare burning in her eyes.

Sharif gave her the smirk he'd mastered through all fourteen years of his existence. The amusement barely reached his eyes. Pitch dark shadow cupped his face–the kind of darkness only an older sister can unravel behind veils of fake excitement, the kind that could spring tears in her eyes at any moment.

She shifted her gaze behind Sharif, towards the glass wall separating them from the world blanketed in darkness. She preferred it over the shadows on her brother's face. She didn't have to carry the burden of lighting up the world all alone.

Saba only had to light up Sharif's face. She winked at her brother, a secret way to tell him to follow her gaze. He implied without hesitation, finding the dessert plates being brought to their table. The *shormalai* on the plates didn't look appetizing anymore, but Saba took comfort in watching Sharif's eyes gleam with delight. Her heart lightened. It had to be because of her brother's smile.

Kiran reached for her hand limp on her lap and whispered, "This is finally paying off."

He had to be talking about the *shormalai*, but Saba pretended it was about that brief unforged excitement in her brother's face. She pretended it was about the sudden rush of butterflies Kiran set free in her.

"Only if you can get it before me." Saba glanced between the plate of sweets and Kiran's face wrinkling into a sly grin. With one swift motion, she picked up the *shormalai* from his plate and swallowed it. She had to have at least two pairs of shocked eyes trained on her, but if she were to become a part of Kiran's family, she had to be comfortable around them.

The cream and sugar itched the back of her throat, but the sweet was a much-needed addition to the bitterness the evening had built up in her.

ওয়াদা

জান্নাতুল ফেরদৌস
ডিপার্টমেন্ট অব ইকোনোমিক্স, ব্যাচ-২০২০

দীপু জানালার পাশে গুটিশুটি মেরে শুয়ে আছে। জানলা দিয়ে এক চিলতে রোদ এসে পড়ছে তার পায়ে। ভোরের মিষ্টি রোদ না, দুপুরের কাঠফাটা কড়া রোদ। পা পুড়ে যাচ্ছে। তবু সে পা সরিয়ে নিচ্ছে না, পা সরিয়ে নেওয়ার জায়গা নেই। ছোট্ট খাটটায় তার পাশে মা শুয়ে আছে। প্রতিদিন দুপুরে খাওয়ার পরেই মা জোর করে ঘুম পাড়ায় তাকে। দুপুরে একটুও ঘুম আসে না দীপুর। মায়ের জোরাজুরিতে দীপু ঘুমের ভান ধরে পড়ে থাকে। মা ঘুমিয়ে পড়লেই জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে অপেক্ষা করতে থাকে রনির জন্য। অপেক্ষার সময়টা খারাপ কাটে না তার। ছোট্ট জানালার ফাঁক দিয়ে আকাশ দেখতে দেখতে কত কিছু ভাবে সে! ঠিক চারটা বাজে রনি জানালা দিয়ে উঁকি দেয়। তখন দীপু খুব সাবধানে উঠে আসে মায়ের পাশ থেকে। এরপর আর পায় কে ওকে! সদর দরজাটা হালকা করে লাগিয়ে রনির সাথে খেলতে চলে যায়।

দীপু গ্রামে থাকে। বিকেলে আশে পাশের বাড়ির ছেলেরা মিলে মাঠে চলে যায়। রনিরা থাকে পাশের বাড়িতে। দীপুদের ঘরের উঠানে দাঁড়ালে রনিদের ঘর দেখা যায়, মাঝখানে শুধু কয়েকটা গাছ সীমানা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আপাতত দীপুদের মাঠে যাওয়া বন্ধ। মায়ের কড়া নির্দেশ। করোনা নামের কি রোগ এসেছে দেশে, স্কুলও বন্ধ হয়ে গেছে। দীপুদের পিইসি পরীক্ষাও হবে না মনে হচ্ছে। সারাদিন বাসায় বসে থেকে থেকে দীপু বিরক্ত হয়ে উঠেছে। মা এখন দীপুকে কারো সাথে মিশতে দেয় না। রোগটা ছোঁয়াছে কিনা, সে কারণে। একমাত্র রনির সাথেই বাড়ির আশপাশে খেলে সে। রনি দীপুর সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। একসাথে ছোট থেকে বড় হয়েছে তারা। দীপুর যাবতীয় সব গোপন কথা রনি জানে, একইভাবে দীপু ও রনির গোপন সব কথা নিজের আমানত বাক্সে বন্দী করে রেখেছে। করোনার এই সময়ে যখন অন্য ছেলেদের সাথে মেশা বারণ, তখন রনির বেলায় মায়ের কড়াকড়ি বেশ শিথিল। রনিকে মা খুব পছন্দ করে। বিকেল বেলা রনি আর দীপু বাড়ির আশে পাশে একটু ঘুরাফেরা করে, মাঝে মাঝে বাড়ির পুকুরে মাছ ধরে একসাথে। স্কুল বন্ধ থাকায় সময় যেন কাটতেই চায় না তার। বিকেলে রনির সাথে যে সময়টা কাটায় সেটাই ভালো কাটে তার। তাই দীপুর কাছে রনির ওয়াদা দেওয়া আছে যে প্রতিদিন বিকেল ৪ টায় সে দীপুকে ডাকতে আসবে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত তারা একসাথে থাকবে। দীপু প্রতিদিন এই সময়টার জন্যই আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে। আজও তাই করছে।

খুব সাবধানে বালিশের পাশ থেকে মায়ের মোবাইলে সময় দেখলো দীপু। ৩ টা বেজে ৫৬ মিনিট। একটু পরেই রনি এসে পড়বে। দীপু একবার মা কে দেখে নিলো। গভীর ঘুমে মা। পেছন ফিরে জানালার দিকে তাকাতেই রনিকে দেখতে পেলো দীপু। জানালার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে সে। দীপু ঠোঁটে আঙুল দিয়ে চুপ করে থাকার ইশারা করলো। তারপর খুব সাবধানে মায়ের পাশ থেকে উঠে এলো।

উঠানে এসেই দীপু রনিকে দেখতে পেলো। এক কোণায় জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে। হাতে একটা বাঁশের কঞ্চি। দীপু বলল,

-রনি চল, বরশিগুলো ঠিক করে রেখেছি। আজকে মাছ ধরবো।

রনি পেছন ফিরতেই দীপুর কাছে রনিকে কেমন অন্যরকম ঠেকলো। রনির পুরো শরীর ভেজা, চোখ টকটকে লাল। এইরকম ভিজে আছে কেন রনি? পুকুরে নেমেছিল নাকি? দীপু আবার জিজ্ঞেস করলো,

-কিরে, এরকম ভিজলি কি করে? ভিজে শরীরে আসলি কেন? জ্বর বাধাবি তো। মনে তো হচ্ছে অনেক্ষণ ভিজে আছিস, চোখ লাল হয়ে গেছে।

-হ্যাঁ, তোকে তো ওয়াদা করেছিলাম বিকেল ৪টায় ডাকতে আসবো। তাই....

এতোক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো দীপুর কাছে। ওয়াদা ভাঙবে না বলেই ভেজা কাপড় না বদলেই দীপুকে আগে ডাকতে এসেছে রনি। এরকম বিশ্বস্ত বন্ধু পেয়ে মনে মনে কিছুটা অহংকারই হলো দীপুর। তবে মুখে কিছু বললো না। রনিকে বলল,

-চল, আগে তোদের বাড়ির দিকে যাই। কাপড় বদলে নিস, তারপর আমরা মাছ ধরতে যাবো।

রনি এই কথার উত্তর দিলো না। শুন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে তাদের বাড়ির দিকে। তখনই দীপু কান্নার শব্দ শুনতে পেল। মনে হলো রনিদের বাড়ি থেকেই আসছে শব্দ। দীপু রনিকে জিজ্ঞেস করলো,

-তোদের বাড়িতে কিছু হয়েছে নাকি?

-জানি না।

-আয় দেখি।

-না, আমি যাবো না।

-কেন? কিছু করেছিস? মার খাওয়ার ভয়ে যাচ্ছিস না? এ কারণেই এখনো ভিজে কাপড় বদলানো হয়নি তোর?

হাসতে হাসতে কথা গুলো বলে গেলো দীপু। উত্তরে রনি শুধু বলল,

-হুম।

-আচ্ছা তুই এখানে দাঁড়িয়ে থাক। আমি গিয়ে দেখি চাচীর রাগ কমেছে নাকি, কাঁদছেই বা কে। পারলে তোর জন্য শুকনো কাপড়ও নিয়ে আসবো। কোথাও যাস না। এখানেই থাকিস। নয়তো আমি এসে খুঁজে পাবো না তোকে।

-আচ্ছা।

দীপু রনিদের বাড়ির দিকে হাটা দিলো। মনে মনে রনির অবস্থা দেখে হাসিও পেলো তার। রনিদের ঘরের সামনে জটলা মতো দেখা যাচ্ছে। বড় কিছুই ঘটিয়েছে রনি, বুঝাই যাচ্ছে। ওদের উঠানে ঢুকার সময় একবার রনিকে দেখে নিলো দীপু। দীপুর দিকেই তাকিয়ে আছে। দেখে বোঝা যাচ্ছে বেচারা খুবই ভয়ে আছে।

মানুষ জনের জটলা এড়িয়ে দীপু রনিদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। কয়েকজন মহিলা মুখে আঁচল চাপা দিয়ে রনির মায়ের পাশে বসে আছে। আর রনির মা বিলাপ করে কাঁদছে। দীপুকে দেখতে পেয়েই চাচী দৌড়ে এসে জড়িয়ে ধরলো তাকে। আর কাঁদতে কাঁদতে বলতে লাগলো,

-আমার রনিকে এনে দে দীপু। আমার রনিকে এনে দে। রনি না থাকলে তোর সাথে কে খেলবে? আমার রনিকে এনে দে।

দীপু এসব কথার মানে বুঝতে পারলো না। কি এমন করেছে রনি যে চাচী এতোটা কাঁদছে? দুজন মহিলা এসে

চাচীকে সরিয়ে নিলো দীপুর কাছ থেকে। চাচী তখনো কাঁদছে। দীপু এতোক্ষণে উঠানের এক কোনে কাউকে শুয়ে থাকতে দেখলো। বিছানার চাদর দিয়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা। কয়েকদিন আগে এই বিছানার চাদরেই চায়ের দাগ ফেলেছে বলে রনি অনেক বকা খেয়েছিলো। চাচীর খুব পছন্দের এটা। দীপু শুয়ে থাকা মানুষটার দিকে এগিয়ে গেলো। মুখের উপর থেকে চাদরটা সরিয়ে সে রনিকে দেখতে পেলো। সাথে সাথে পিছিয়ে গেলো সে। এটা কি দেখছে সে? এতোক্ষণে এতো মানুষ, চাচীর কান্নার কারণ পরিষ্কার হলো দীপুর কাছে। তবু দীপু কারণটা মানতে পারছিলো না। একটু আগেই তো রনিকে দেখে এলো সে। রনিই তো তাকে পাঠিয়েছে এখানে। সে মুখ তুলে মানুষগুলোর দিকে তাকালো। পাশের ঘরের শফিক চাচা এসে দীপুকে ধরে বলল,

-রনি আর নেই রে দীপু, পুকুরে ডুবে এই অবস্থা। একটু আগেই লাশ উঠিয়েছি পুকুর থেকে।

দীপু চাচার হাত ছাড়িয়ে দৌড়ে নিজেদের উঠানে এসে দাঁড়ালো। রনি নেই এখানে। দীপু বুঝতে পারছে না কি হচ্ছে। সে চিৎকার করে রনিকে ডাকতে লাগলো। একসময় ডাকতে ডাকতেই দীপু মাটিতে বসে পড়লো।

দীপু কাঁদছে, তার সাথে অনবরত রনিকে ডাকছে। তবু নিজের প্রিয় বন্ধুর কাছ থেকে কোনো সাড়া পেলো না সে।

A Rainy Morning Incident

Tasnim Naz
Department of English, Batch: 2017

Outside the ninth floor bedroom window- a storm slowly brewed. The window was locked, making it impossible to feel the raging mood change outside. The person inside the enclosed walls was fast asleep in a dreamless landscape. But there's always something that ties nature to its inhabitants, a primitive connection. Either from that primitive connection or from several missed alarms or a body's natural alarm clock; the person woke up. He slowly stared out into the distance of his messy bedroom; his surroundings full of organized chaos. Several half-open, half-flapped over books lay around him. And he lay in between them all. He felt the storm, even before he heard it. He looked up at the windowsill, and he instantly knew.

He was going to drench himself in the rain that morning.

The adventurous boy drenched his face with cold water first, waking him up even more. He had a slow pulsating heart, which matched the slow thumping of the storm outside. There was a quiet anticipation and a fear- an anticipation to tie in a long tradition of childhood rain-drenching; and a fear that the rain might leave and never come back again. Breakfast would have to wait- some things you just cannot delay, he told himself. As he left his room with a towel on his back, he came back and grabbed his phone. He smiled at the phone, and the phone smiled back at him. He pocketed a pack of cigarettes and left for the stormy skies.

The rain on the highest roof fell in small crystal droplets. These droplets cannot be bought, cannot be sold- and yet there's nothing more precious. The rain fell in stages, it fell in rhythms. Spend enough time with the rain, and you can almost match its rhythm. The daring boy tried to match the rain's rhythm. The crystal droplets fell on the surface of his skin and he was transported back to every single good memory in his head, and in his heart. He let the rain wash over him, the face on his skin, his hands, his legs, in between the cracks of his sole and in between every cuticle. It wasn't enough though; there was a need for more surface area. He looked around him, and quietly slip out of his drenched T-shirt. He hung the shirt around his shoulders and let his new skin expose itself to the rain. In a matter of moments, he was one with the rain- the adventurous boy matched the rain's rhythm. As the rain slowed down, he brought out a cigarette and lit it up gently. He stood under the heaving sky and remembered why he smoked at the first place. A dangerous hobby, a slow and painful death- but a feeling unmatched by any.

The smoking man put the towel over his head. The rain reminded him of a number of things- serenity, childhood, sadness, lust. He speculated that the rain in his country was unmatched by any other. But more importantly, the rain reminded him of her.

He took out his phone and dialed her number. He knew she was asleep, unaware of the rain. On the other side of the town, the sleepy girl lay fast asleep- unaware as he had speculated. Her phone rang and it woke her up. She rubbed the sands away from her eyes. Similar to the boy, her window was shut closed. The star struck boy listened to the sleepy “hello” on the other end and smiled. She reminded him of the rain.

“It’s raining outside.”

“Is it?”

She got up and drew her curtains aside. The remnants of a long lost rainfall presented itself to her. The road beneath her was glistening; the pavements were glossy dark and little puddles lay everywhere. The scene saddened her. She had missed the rain. She let out the tiniest sigh. On the other end of the phone, the drenched boy picked up on the sigh.

“Are you looking out your window?”

“I am.”

“What do you see?”

“I see the sky, it’s dark and gloomy.”

“So do I. We’re looking at the same thing, you and me.”

“Yes we are.”

Little streaks of sunshine began to pierce through the clouds. The tiniest bit of heat pervaded the cool air on the roof. It was still windy though- a small gulf of warm air mingled itself to the rain. The sleepy girl looked up at the streaks of light and said,

“Did I ever tell you that the rain reminds me of you?”

The boy sneered, “I know, love.”

মায়ের চাদর

এস এম নাহিদ সরওয়ার সুমন
আইন বিভাগ, ব্যাচ-২০২০

এক.

হাই রোড ধরে খুব ক্ষিপ্র গতিতে ছুটে চলছে গাঢ় সবুজ রঙ্গা গাড়ীটা। জানালা দিয়ে দূরে তাকিয়ে আছেন রাহেলা বেগম। তার ঠিক বুঝেই আসছে না, আসাদ কদিন থেকে হঠাৎ এতো ভালো ব্যবহার শুরু করলো কেন! অথচ কতই না অবহেলার দিন কেটেছে তার কলোনীর ছোট স্টোর রুমটায়। আজ কি না তার জন্যেই এতো আয়োজন,

আজ বনভোজন!

রাহেলাকে নিয়ে তারা খুব কমই তারা কোনো পার্টি বা অনুষ্ঠানে যায়, পারতপক্ষে তারা চেষ্টা করে না নিয়ে যাওয়ার। অথচ আজ কি না তার জন্যেই শহর থেকে এতো দূরে বনভোজনের আয়োজন করেছে তার একমাত্র ছেলে-বৌ, তার যেন বিশ্বাসই হচ্ছে না। সবচেয়ে অবাক করা বিষয় তার পছন্দের গাজরের হালুয়াও হয়েছে আজ, না বলা সত্ত্বেও। ভাবা যায়!

দুই.

চোখ মেললেন রাহেলা বেগম। আশপাশ কেমন অন্ধকার অন্ধকার। তিনি ঠিক বুঝতে পারছেন না তিনি কোথায়, আর কেনই বা ঝিঁঝির ডাক এতো তীব্র শোনাচ্ছে, যেন মগজে ঢুকে চিৎকার করছে ওরা। কলোনীতেও এর ডাক শোনা যায়, তবে এতো তীব্র আর সজীব নয়। অনেকটাই ক্ষীণ। একসময় তিনি অনুভব করলেন তিনি কোনো বিছানায় নেই, শুয়ে আছেন শক্ত এক মেঝেয়, হাত দিয়ে বুঝলেন মেঝেটা কংক্রিটের। আস্তে আস্তে সব মনে পড়তে শুরু করলো তার। বুঝলেন ছেলে ও ছেলে বৌর অতিরিক্ত খাতিরের কারণ।

কি সাংঘাতিক! কি নিষ্ঠুর!!

তিন.

লো ভলিউমে গান বাজছে। হালকা ড্রিঙ্ক করেছিলো আসাদ। গলায় ওটা না পড়লে অমন কাজ কি সহজে করা যায়! যাক বাবা বাঁচা গেল। যত্তসব ঝামেলা। আরেকটুর জন্য কলোনী থেকে বেরই করে দিয়েছিলো। কিসব করোনা ফরোনা সন্দেহে। সবাইকে কত বুঝালাম বুড়ি বাইরে যায় না, তার এটা সাধারন জ্বর সর্দি। নাহ! তারা মানবে কেন। শেষে কলোনী পর্ষদের সাহেদ দার হাতে মোটা কিছু দিয়ে রক্ষা। এ বুড়ী না থাকলে কি আর অতোগুলো টাকা জলে যেত? যত্তসব উটকো ঝামেলা। যাক গেছে মাথা থেকে, বাঁচা গেল বাবা।

অন্যমনস্কভাবে রিয়ারে চোখ পড়লো আসাদের চমকে উঠে দেখলো, সুহার মুখটা অবিকল রাহেলা বেগমের মতো দেখাচ্ছে। ঘুমালে মানুষকে কতো নিস্পাপ আর পবিত্র দেখায়। আর, আর ওর গায়ে আলগোছে থাকা চাদরটা! আরে ওটা ওই বুড়িটার না।

ঠিক তখনই ঘটলো ঘটনাটা, সেকেন্ডের একটু এদিক ওদিক। গাড়ীর ব্রেকের ওপর যেন দাঁড়িয়েই গিয়েছিলো ও, না হলে!

আর ভাবতে পারলোনা আসাদ।

চার.

প্রবল ব্রেকের ঝাকুনিতে সুহা আর রেনুকা জেগে উঠেছে। সাইডে গাড়ীটা লাগিয়ে একটা সিগারেট ধরালো ও। নেমে এলো রেনুকাও। কি আশ্চর্য, রেনুকার গায়ে ওই চাদরটা! ছাইটার জন্য আরেকটু হলে ট্রাক চাপা পড়তো ওরা। এক ঝটকায় চাদরটা লুফে নিলো আসাদ। রেনুকা হতভম্ব।

'কি হলো!' -উদ্বিগ্ন চিৎকার রেনুকার।

'কিছু না,' -তাচ্ছিল্য আসাদের কণ্ঠে।

চাদরটা হাতে নিয়ে অন্যমনস্ক হয়ে গেল আসাদ। চাদরটার বয়স কতো হবে? আরেহ! চট করে মাথাটা চক্কর দিয়ে উঠলো আসাদের। তার প্রথম সেলারি থেকে মাকে দেয়া চাদরটা না। অথচ কতো যত্নেই না রাখা হয়েছিলো ওটা, যে প্রায় এগারো বছরেও কাপড়টাতে বয়সের কোনো ছাপই পরে নি। হঠাৎ মাথায় কি খেলে গেল আসাদের।

পাঁচ.

চোখের ইশারায় রেনুকাকে গাড়ীতে উঠতে বললো ও। ঝটকায় দরজা খুলে স্টিয়ারিং হাতে সেকেন্ড দুয়েক কি ভাবলো মায়ের ছেলেটি। তারপর ইউটার্ন নিলো গাড়ীটা। রেনুকা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেও কিছু বলার সাহস করলো না। কারণ ও জানে এখন কোনো প্রশ্নের উত্তর পাবে না। অগত্যা নিশ্চুপ থাকলো রেনুকা। কিন্তু সে হয়তো লক্ষ করলোনা আসাদের চোখ জোড়া ভিজে আছে।

পাথরও তাহলে গলে? কে জানে!

Carnival of Rust

Azharul Islam
Department of International Relations
Batch: 2019

Once upon a time there was a tree. A rare species, just once of its kind. Fruits it gave were red, too sweet and unusually big. More over it was not seasonal, nor periodical rather was whimsical! It is said that its fruit brought renaissance! I don't know, I just heard about the tree. Adam was the first one to taste those. And we're here in this mortal world for that apple. The next one fell upon Newton who changed the world by adding an extra weight to our mass. The last one was for a man called Steve Jobs. The gravity of his revolution brought a renaissance to the sons of Adam unlikely the apple he ate. So, these three apples actually brought a change in our world. For them, we got the courage to hail ourselves and announce our identity to all lives created to date.

So, the point of my utmost attention on revolution is the x-factor for us being here. In traces its roots deep down into the pages of history when civilization was still a teenager. Even the time when we first ignited fire, we're afraid, panicked and run away. But soon we used it in our pavement. After that it became a history. Then we rowed for long. By time we changed. We lost our path. We entered anarchy and darkness.

We killed and drank like mad. Fraud, slavery, injustice, barbarism engaged us all. Just then we came up with one of the most sacred ideas of human civilization. We found religion. It had been a lantern in our darkness. It drove away our dark sins and enlightened us with the love for God and for humanity. It changed the track of our journey by redefining the purpose of living. The revolution that kicked off with an introduction to religions, found its result at currency of world peace, humanity, generosity and advancement of human civilization. And the most interesting part is that revolution has no definite period. It starts from nowhere can lead to anywhere. Revolution is a pocket full of gunpowder waiting for a splinter to explode.

Millions of painstaking lives got a source of relief by finding a way to the grave. It was time when the plague spread its claws. It was found epidemic and soon spread amongst people both mentally and physically. It was a terror known as the Black Death. The story is supposed to end here. But my pen won't stop as I got a lot more to tell as humanity escaped a certain death. We stood up. The legends say about a mystique bird which grows up from its own destruction, its own ashes and rises up to born again. It spread its wings of fire which dazzled magnificently in the blue sky…

the phoenix. But like the legend after a distortion and destruction it truly ignited. Now it's time to talk about it. Though the gravity or his gravitation was not something special but Newton found a new way to think about it. He stirred a renaissance leading to massive improvement of science and technology to 19th and 20th century. Though the revolution had a new look. Something that could only be defined as an up-rise that hailed our torch which made Europe a supreme continent, which opened our eyes and showed us the dream of every black people equality which enlightened this superstitious Indian subcontinent and made it as one of the greatest potential zones on the earth today which removed slavery and gave human their freedom. Yes, today we can say that we conquered the world. But today's revolution is the polluted reason of drone? To kill innocent people of Gaza? Did Plato or Aristotle's revolutionary ideas about politics was to suppress people in the name of leading them to progress? Definitely Not. Renaissance doesn't mean revolt, banners and bloodshed. It is the way that makes people aware that human beings are the best of all creatures for a reason… a purpose for a greater good. They say necessity is the mother of inventions. That's why whenever people start to forget his true identity and sole purpose, renaissance shows us the way and we do it together. That is why today's human civilization is renovated with architectural blue point of renaissance.

Due to fear, mistrust and lies, today's chaos is happening. We are forgetting to be humane. That's why we need to show that above the international borderlines racism, laws and orders, we are one and for all. So today we need durian of all. Now we have to move on by our own.

To the apple tree:

Thank you for the fruit you gave us for which we could figure out our identity through renaissance. We owe you and your debt will surely not go in vein. We will rise and hail our torch.

And to the mankind:

The tree had done its job. Now it's our time. The world needs a change. We need to protect ourselves from the deadly viruses together. So it's time for us to do for our own interest. We gave to start a new story, a new revolution and a new renaissance. It's now or never.

ফাইনম্যান টেকনিকের আদ্যোপান্ত

মো. তানজিল হোসেন
বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন মার্কেটিং বিভাগ
ব্যাচ-২০১৯

আইনস্টাইনের একটি বিখ্যাত উক্তির কথা মনে আছে?

" If you cant explain it simply, you don't understand it well enough."

অর্থাৎ আপনি যদি কিছু খুব সহজে না বুঝে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনি ভালোভাবে বুঝেননি। কোনো জটিল একটি বিষয়কে যখন খুব সহজে বোঝানোর চেষ্টা করা হয়, ঠিক তখনি বোঝা যায় আসলে সেটা ঠিক কতখানি আয়ত্ত্ব করা হয়েছে। এবং একইসাথে ঐ বিষয়টিতে নিজের সমস্যাগুলো ঠিক তখনি উপলব্ধি করা যায়, কেননা কিছু জায়গা থাকবে যেখানে আপনি হয়ত সমস্যাটি সমাধান করতে গিয়ে আটকিয়ে যাবেন নয়তো আবারো সেই জটিলতার ফাঁদে ফেরত আসবেন।

ফাইনম্যান নামক কৌশলটির এটাই মুল প্রতিপাদ্য।

নোবেল পুরস্কার জেতা বিখ্যাত পদার্থবিদ রিচার্ড ফাইনম্যানের নামে কৌশলটি আজ বিশ্ব সমাদৃত। ব্যক্তিজীবনে ফাইনম্যান পরিচিত ছিলেন অসাধারণ বিজ্ঞানী হিসেবে এবং একইসাথে তিনি পরিচিত ছিলেন 'সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষক' হিসেবে। কেননা তাঁর একটি সুখ্যাতি ছিলো, তিনি যে কোন জটিল বিষয়কে খুব সহজে, অবলীলায় এবং আকর্ষণীয়ভাবে বোঝাতে পারতেন। 'ফাইনম্যান টেকনিক' এর তিনিই আবিষ্কর্তা। 'ফাইনম্যান টেকনিক' এমন এক পদ্ধতি যেখানে যেকোনো বিষয়কে খুব সহজে দ্রুততার সাথে শেখানো হয় এবং পুনর্মূল্যায়ন করা হয়-সেটা কিভাবে? সহজ, সরল ভাষায় ব্যাখ্যা করে।

আপনি যে বিষয়টি শেখার চেষ্টা করছেন সেই বিষয়ের সমস্যা ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত করার পাশাপাশি, ফাইনম্যান টেকনিক সেই কাঙ্ক্ষিত বিষয়গুলো শিখিয়ে তা আয়ত্ত্বে আনার একটি কার্যকরী উপায়। এটা খুব সহজ একটি কৌশল কিন্তু কৌশলটি আপনার জীবনে তখনি প্রভাব রাখা শুরু করবে যখন আপনি তার চর্চা শুরু করবেন।

টেকনিকটির ব্যবহার কীভাবে করবেন ভাবছেন? প্রথমেই জেনে নেই টেকনিকটি আবিষ্কার কীভাবে হলো!

ফাইনম্যান টেকনিকের অস্তিতের খোঁজে

রিচার্ড ফাইনম্যানকে সবসময় নতুন কিছু শেখার নেশায় বশীভূত করে রাখতো। যেখানে তিনি যেটা জানতেন না সেটা শেখার চেষ্টা করতেন, সেই বিষয়টির সাথে সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করতেন। তাঁর শেখার এই প্রক্রিয়াটাকে কার্যকর করার জন্য তিনি সবসময় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। তাই ফাইনম্যান সাহেব যে বিষয়টিকেই নিজের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন তা সাথে সাথে লিখে ফেলতেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তিনি নিজেও জানতেন না তিনি আসলে কি লিখছেন। তাঁর নিজস্ব কতগুলো খাতাই ছিলো সেই অজানা বিষয়বস্তু লেখালিখি করার জন্য। তিনি সেই খাতাগুলোর বেশ অদ্ভুত এক নাম দিয়েছিলেন, তা হলো আমি যা জানি না।

তারপর তিনি তাঁর খাতার সেই বিষয়বস্তুগুলোর উপর ধীরে ধীরে আয়ত্ত্ব করা শুরু করেন। বিষয়বস্তুগুলো অপরকে শেখানোর সময় তিনি লক্ষ্য করলেন তিনি আসলে বিষয়টি বেশ ভালোভাবে বুঝতে পারছেন, যে ব্যাপারটি নিয়ে তিনি পূর্বে ঘন্টার পর ঘন্টা মাথা ঘামিয়েছেন তা যেনো এক নিমিষেই বেশ সহজ হয়ে তাঁর চোখের সামনে ধরা পড়ছে! ঠিক সেখান থেকে ফাইনম্যান কোনো কিছু শেখার এবং শেখানোর কিছু ধারাবাহিক পদক্ষেপ তৈরি করেন। আর তারপর? বিখ্যাত 'ফাইনম্যান টেকনিক' এর জন্ম।

ফাইনম্যান টেকনিক ব্যবহারের উপায়

যেহেতু এই টেকনিকের মূল ভিত্তিই হচ্ছে আপনি যা কিছু পড়ছেন বা শিখেছেন সেই বিষয়টিকে খুব সহজভাবে বোঝানো, তাই এই পদ্ধতিকে বিভিন্নভাবে কার্যকর করা যেতে পারে। আপনি আপনার বন্ধুকে ডেকে এনেও আপনার পঠিত বিষয়টি বোঝানো শুরু করতে পারেন। কিন্তু হাতের কাছে এমন বন্ধু পাওয়াটাও বেশ ভাগ্যের ব্যাপার। এখানে বেশ কিছু নিয়ম উল্লেখ করা হবে, যেটা সম্পাদন করতে শুধু দরকার একটি পৃষ্ঠা। ব্যস!

প্রথম ধাপ: একটি খালি পৃষ্ঠা নিন এবং যেই বিষয়টি নিয়ে পড়তে যাচ্ছেন অথবা শিখতে যাচ্ছেন সেটা একদম উপরে লিখে ফেলুন। এবং সেই উল্লিখিত বিষয়টি একবার নিজের মতো পড়ে একটা ধারণা তৈরী করে ফেলুন। যেকোনো বিষয়ই এই নিয়মে আয়ত্ত করে নেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয় ধাপ: এই ধাপে আপনার পঠিত বিষয়টির একটা নিজের মতো ব্যাখ্যা দাঁড় করান এবং সেটা লিখে ফেলুন। ব্যাখ্যাটা এমনভাবে হতে হবে যেনো আপনি কাওকে শেখাচ্ছেন। তাই সহজ, সাবলীল ভাষা ব্যবহারের কথা মাথায় রাখবেন। নিজেকে চ্যালেঞ্জ করুন, আলোচ্য বিষয়টি থেকে দুই-তিনটি উদাহারণ দাঁড় করান। শেখানোর একটা মানসিকতা তৈরি করা দরকার। এমনভাবে আচরণ করুন, যেনো একটি অবোধ শিশুকে আপনি বোঝাচ্ছেন।

তৃতীয় ধাপ: যখনই কোনো জায়গায় আটকে যাচ্ছেন, অথবা অনুভব করছেন যে ব্যাখ্যাটি নড়বড়ে; সেগুলি চিহ্নিত করুন এবং সাথে সাথে বই, লেকচার ইত্যাদিতে ফিরে যান। মনে যদি ঐ অংশটুকু নিয়ে সংশয় জাগে সেটার সমস্যা দূর করতে সাথে সাথে টেক্সটবুক, লেকচারশীট, গাইড ইত্যাদি খুলে ঐ লাইনটুকু বা অংশটুকু আরেকবার পড়ে নিন। তারপর জেনে নিয়ে আবার নিজেই নিজেকে বোঝাতে শুরু করুন।

চতুর্থ ধাপ: আপনার নিজের করা ব্যাখ্যাগুলো যদি আবার এলোমেলো হওয়া শুরু করে অর্থাৎ আবার যদি জটিল কেতাবী ভাষার আবির্ভাব হয়, তাহলে পুরো বিষয়টি আবার নতুন করে লিখে ফেলুন। আপনার লেখা অথবা আপনার বোঝানোর ক্ষমতা যদি সবার দ্বারা বোধগম্য হয় তবেই এই টেকনিকের আসল সফলতা।

এই টেকনিকটার সবচেয়ে বড় গুণটা হচ্ছে, এভাবে টপিকে কোন জটিল বিষয়বস্তুর বেসিক ফাউন্ডেশনটা ভাল করে বোঝা হয়ে যায়। যেমন কোন জিনিস ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যদি আরেকটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয়বস্তুর সাহায্যে ব্যাখ্যা করা হয় এবং ঐ জিনিসটা যদি আপনার জানা না থাকে, তাহলে আপনি নিজেই নিজেকে বোঝানোর সময় টের পাবেন। তখন, বই-পত্র ঘেঁটে ও বিষয়টি সম্পর্কে জেনে নিয়ে আবার নিজেকে বোঝাতে পারবেন। এভাবে করে জটিল টপিক সহজ হয়ে অনেক দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। ভাসাভাসা কিছু না শিখে সত্যিকারের মতো কিছু শেখা হবে। গতানুগতিক ভাবে যদি ব্যর্থ হন কিংবা সময় বেশি লাগে, তাহলে ফাইনম্যান টেকনিক শুরু হোক আজ থেকেই। তো, সাদা কাগজ নিয়ে বসে পড়ুন।

Havoc wrecker?

Arshia Habib Susmi
Dept. of ICT, Batch: 2019

Who ever thought that a particle smaller than even a sand, which doesn't even have a full strand of DNA could create such a chaos! COVID-19 has stopped the world. Putting us all in a dilemma it has gone to a silent mode when nobody seems to know how to bring it back. These empty streets, vacant stadiums and our campus without our chirpings feel unnatural. This fear of unknown seems unnatural. I can bet most of us have never encountered anything like this before. This paradox of life and death has put us all in a situation when even people like me, the vagabonds, are also thinking about the worth of this life. When world is taking the hardest of its tests, I decided to fight till the last breath of my life and I get the motivation simply from the surroundings around me which I always took for granted. From the entities around me which are forcing me to recapture my perspectives.

If looked closely, we are all in this situation together. More together than we have ever been. News from social media of helping one another is compelling me to think and realize the facts and actual necessities of our lives in a very new way. There is isolation but not loneliness. We all are beaming with morals where meanness is slowly going away. There is maybe illness all around but our souls are healing. Rebirth of love has transformed the reality and is making our mind as clear as the sky! This quietness everywhere is bringing clarity to our mind and I am beginning to actually see. It's now clear that whomever we pray to, we are not so different.

Apart from all the identities, the oneness I am feeling, just because of being a human, is inspiring me to go on and giving me the mental stimulation to hold my faith on mankind. This divine guidance is making me believe that this too will pass and all we need to do is to keep steady and take this whole trauma as a restart button of our lives. This lesson of unity and strength is certainly going to make this world a better place to live in.

Dedicated to humanity and all the frontline soldiers who are fighting against COVID-19 for us. They are Inspiring and teaching me the true meaning of love and compassion. Not even anything bigger than corona can defeat us when we are together.

সুখ

আব্দুল্লাহ আল মারুফ
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, ব্যাচ-২০১৭

ডিভোর্সের তিন বছর পর আমার মা দ্বিতীয় বিয়ে করলেন। একমাত্র মেয়ে হওয়ায় খুব কম মানুষের একজন হয়ে আমি আমার মায়ের বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিলাম। অবশ্য অনুষ্ঠান বলতে একেবারেই পারিবারিকভাবে হয়ে গেছে বিয়েটা। খুব বেশি লোক জানাজানি হয়নি। হলে অবশ্যই তা মায়ের জন্য ভালো হতো না। শুরু থেকেই আমার মায়ের নতুন স্বামীকে আমি মেনে নিতে পারছিলাম না। আমার নিজের বাবা দেখতে ছিলেন রাজপুত্রের মতো। যদিও তিনি আমাকে খুব কম সময়ই আদর করতেন; আর আমার মায়ের উপর খুব অত্যাচার করতেন, তারপরও আমার বাবা-মার ডিভোর্সের ব্যাপারটাতে আমি মোটেও খুশি হতে পারিনি। স্কুলের সব বন্ধুরা আড়ালে এমনকি সামনাসামনিও অনেক কিছুই বলত। তাতেও আমি কষ্ট পেতাম না, ছোটরা এমন অনেক কিছু বলতেই পারে। কিন্তু মাঝে মাঝে অনেক বড় মানুষ, এমনকি আমার শিক্ষকেরাও এটা নিয়ে প্রশ্ন করতেন আমাকে- কেন ডিভোর্স হলো, বাবা-মা কি আবার বিয়ে করবে কিনা, আমি কার সাথে থাকব, আরও কত কি! চুপ করে থাকা ছাড়া যেগুলোর বেশিরভাগেরই কোন উত্তর আমার কাছে ছিল না। তারপরও আমি মাঝে মাঝে রেগে গিয়ে উল্টাপাল্টা কিছু বলে বসতাম। দশম শ্রেণির একটা মেয়ের কাছ থেকে এমন ব্যবহার পেয়ে অবশ্যই আমার শিক্ষকেরা খুব একটা খুশি হতেন না।

স্বাভাবিকভাবেই মায়ের বিয়ে নিয়েও আমার অনেক কথাই শুনতে হয়েছে। এসবই হয়তো মেনে নেওয়া যেত যদি নতুন লোকটাকে আমার ভালো লাগত। যেদিন মাকে দেখতে এসে বিয়ের কথা ঠিক করে গিয়েছিল, সেদিনই আমি তাকে দেখেছি। মাথায় বিশাল টাক পড়া, শ্যামলা চেহারার এক লোক, লোমশ হাত। কেমন ভয়ংকর চেহারা। আমার নিজের বাবার ধারেকাছেও নেই তিনি। আমি আর ওই ঘরে থাকিনি। চলে এসেছিলাম আমার ঘরে। আমার নানী যখন বললেন দেখতে শুনতে একটু পিছিয়ে থাকলেও লোকটার আচার ব্যবহার ভালো, কেনো যেন বিশ্বাস করতে পারিনি।

ভাদ্র মাসের তালপাকা গরমের একদিনে আমার মায়ের বিয়ে হল। নানা বাড়ির বসার ঘরটা সুন্দর করে সাজালেও একমাত্র কুৎসিত ব্যাপার ছিল, নতুন লোকটার ঘর্মাক্ত চেহারা, আর পুরনো একটা রুমাল দিয়ে তা মোছার ব্যর্থ চেষ্টা।

বিয়ে হয়ে গেলে আমি আর মা নানা বাড়ি ছেড়ে আমাদের নতুন বাড়িতে চলে আসলাম। মা খুব তাড়াতাড়ি মানিয়ে নিলেও আমি একদমই মানাতে পারছিলাম না। নানাবাড়িতে মামাতো ভাই বোনদের সাথে হুল্লোড়ে মেতে থাকা আমি একা হয়ে গেলাম এ বাড়িতে এসে। নতুন লোকটা ব্যস্ত অফিস নিয়ে, আর মা ব্যস্ত তার ভেঙে পড়া সংসার গুছিয়ে নিতে। যদিও লোকটা মা ও আমার সাথে খুবই ভালো ব্যবহার করতো, সব সময়ই আমার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করতো, আর কিছুটা সহজ সরলও ছিলো, তারপরও আমি তাকে কখনোই বাবা বলে ডাকিনি। কেন যেন ইচ্ছে হয় না তাকে বাবা বলতে। মনে মনে আমি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করি। এর অবশ্য অনেকগুলো কারণ ছিল। যার মধ্যে অন্যতম হল তার চেহারা। আরও হলো, তিনি আমার মা যে আস্তে আস্তে আমাকে কম সময় দিতে শুরু করেছে, সেটা আমি একেবারেই মেনে নিতে পারিনি। আমার দাদাবাড়ির আত্মীয়রাও মাঝে মাঝে যোগাযোগ করে সৎ বাবা

কেন খারাপ হয়, আর কদিন পরেই যে আমাকে বাসা থেকেই বের করে দিবে এসব বুঝাতে চেষ্টা করত। আসলে সব কিছু নিয়েই আমি কতটা ভয়ানকভাবে ভেঙে পড়ছিলাম তা বুঝতে পারি।

আস্তে আস্তে আমার মাধ্যমিকের টেস্ট পরীক্ষা এসে চলেও যায়। রেজাল্ট পেয়ে আমি হতবাক হয়ে গেলাম। প্রচণ্ড মানসিক চাপে থাকায় আমি তিন সাব্জেক্টে ফেল করে বসেছি। এমনিতেই খারাপ রেজাল্ট, তার উপর শিক্ষকদের সাথে খারাপ ব্যবহারে আমাকে স্কুল থেকে বহিষ্কার এর সিদ্ধান্ত নিতে খুব একটা ঝামেলা হয়নি প্রিন্সিপালের জন্য।

বাসায় এসে খুবই ভয়ে ভয়ে আমি মাকে জানাই সে কথা। মা অনেকক্ষণ ধরে বকাবকি করে আমার কান্না আরও বাড়িয়ে দেয়। আমি নিজের ঘরে চলে যাই। আমি জানি, কোনোভাবেই আমার মা স্কুলে যেয়ে স্যারের সাথে কথা বলবেন না। এমনিতেই দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে তাকে অনেক কথাই শুনতে হয় বাসার বাহিরে গেলেই। তাই আমি ধরেই নেই, এ বছর আর আমার পরীক্ষায় বসা হবে না।

পরদিন সকালে মা আমাকে ডেকে নতুন লোকটার সাথে স্কুলে পাঠায়। প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে তিনি ঢুকলেও আমাকে বাহিরেই দাঁড়াতে হয়। সেখানে দাঁড়িয়েই আমি শুনি কিভাবে আমাদের ভীষণ কড়া প্রিন্সিপাল স্যারের কাছে আকুতি জানিয়ে লোকটা বলছে যেন তার মেয়েকে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হয়। তাকে নরম হতে দেখেই হয়তো প্রিন্সিপাল স্যার আরও কড়া হয়ে উঠেন। হঠাৎ ভিতর থেকে কান্নার শব্দ শুনে আমি বুঝতে পারি তিনি কেঁদে ফেলেছেন। এর আগেও আমি শুনেছি লোকটা অল্পতেই মন খারাপ করে কেঁদে ফেলেন। আমার ভীষণ লজ্জা হতে লাগল ভিতরে কি কথা হল তা আর আমার শোনা হল না।

বাড়ি ফিরে আমার ভীষণ জ্বর এসে গেল। সন্ধ্যার দিকেই ওষুধ খেয়ে আমি ঘুমিয়ে পড়ি। রাতে হঠাৎ করেই আমার ঘুম ভেঙে যায়। সময়ের হিসাব ছিল না আমার, কিন্তু বুঝতে পারি বেশ রাত হয়ে গেছে। আমার মাথার পাশের চেয়ারটায় লোকটা বসে আছে। মাথায় পানি দিয়ে দিচ্ছিল হয়তো, মগ হাতেই ঘুমিয়ে গেছে। আমি দুর্বল শরীরে উঠে বসতেই তার ঘুম ভেঙে যায়। ধড়মড়িয়ে উঠে জানতে চায়,

- কিরে মা, কষ্ট হচ্ছে? সরি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। তুই ঘুমা। আমি মাথায় পানি দিয়ে দিচ্ছি।

আমার চোখ ভিজে উঠল। আমার নিজের বাবাও কখনো আমাকে এভাবে আদর করে মা বলে ডাকেনি। এতদিন ধরে এই মানুষটাকে ভালো না লাগার জন্য আমার নিজের উপর বেশ রাগ হতে লাগল। আমি শব্দ করে কেঁদে উঠে তাকে বললাম,

- আমার কষ্ট হচ্ছে না, বাবা, আমি ঠিক আছি।

এতদিনে এই প্রথমবার আমি তাকে বাবা বলে ডাকি। আমার ভালো মানুষ বাবা খুশিতে মাকে ডেকে আনেন। নতুন সন্তানের মুখ দেখে বাবারা যেমন খুশি হয়, আমার মুখে বাবা ডাক শুনে তিনিও ততটাই খুশি হয়ে উঠেন। ঘুম থেকে উঠে এসে মা হাসিমুখে দরজায় দাঁড়ায়। আমি ছুটে গিয়ে বাবাকে জড়িয়ে ধরে সরি বলি। আমার কান্না দেখে বাবাও কেঁদে ফেলেন। তাই দেখে মা আরও হেসে উঠেন, এতদিন পরে এই বাসায় যেন সুখ নেমে আসে।

আমার ভালো মানুষ বাবা আমার চোখ মুছিয়ে দিয়ে হেসে উঠে। মাত্র কয়েক বর্গফুটের এই ঘরেই যে স্বর্গ নেমে আসতে পারে, সেই প্রথমবারের মতো আমি তা বুঝতে পারি।

ইলন মাস্ক: স্বপ্ন যখন বিশ্বজয়

ফারদিন ইসলাম
অর্থনীতি বিভাগ, ব্যাচ-২০১৮

কমিক্সের সুপারহিরোদের কে না চেনে? সকল অসম্ভবকে সম্ভবপর করাই ছিল এসকল সুপার হিরোদের কাজ। রূপকথার ন্যায় ঠিক তেমনি বাস্তবেও কিন্তু এমন একজনের দেখা মেলে যিনি তাঁর অসাধারণ উদ্ভাবনী বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দিয়ে নতুনভাবে রূপ দিচ্ছেন পৃথিবীকে। নাম তাঁর ইলন মাস্ক। প্রায় ৭৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সম্পত্তির মালিক ইলন মাস্ককে বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে সফল উদ্যোক্তা হিসেবে পরিচয় দেওয়া হয়। বিচিত্র চিন্তাধারার এই মানুষটির জীবনধারা আমাদের অনেক অনুপ্রেরণার জোগান দেয়। অনেকের মতে হালের ইলন মাস্ক অনেকটাই সেই কেএফসির কর্নেল স্যান্ডারস কিংবা আলিবাবার জ্যাক মা এর প্রতিচ্ছবি, যারা শত ব্যর্থতা পেছনে ফেলে সাফল্যের চূড়ায় আরোহণে সক্ষম হয়েছিলেন। কম্পিউটার প্রোগ্রামিং থেকে শুরু করে মঙ্গলের লাল মাটিতে প্রাণের বিকাশে পদচারণ- এত লম্বা যাত্রাপথটা কিন্তু মোটেও সুগম ছিলো না। দেখে আসা যাক প্রিটোরিয়ার ছোট্ট এক বালকের বিলিয়নিয়ার উদ্যোক্তা হওয়ার গল্প-

পুরো নাম "ইলন রিভ মাস্ক," জন্ম ১৯৭১ সালে, দক্ষিণ আফ্রিকায়। ছোটবেলা থেকেই বইয়ের প্রতি খুব ঝোঁক ছিল ইলনের। মাত্র নয় বছর বয়সে ঘরে বইয়ের অভাবে তিনি শেষমেষ পড়া শুরু করেন বিখ্যাত এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা, যা তিনি একসময় পড়া শেষও করে ফেলেন! জীবনে অনেকটাই চুপচাপ থাকার কারণে স্কুল পড়ুয়াবস্থায় প্রচন্ড নির্যাতনের শিকার হতেন, জীবনের শুরুতেই এত এত মানসিক চাপ কোনোভাবেই তাঁর সাফল্যের অগ্রযাত্রাকে শিকল পড়িয়ে রাখতে পারেনি। মাত্র ১২ বছর বয়সেই তিনি ব্লাস্টার নামক একটি মজাদার ভিডিও গেম তৈরি করে ফেলেন এবং সেই ভিডিও গেমটি তিনি একটি ম্যাগাজিনের কাছে বিক্রি করে নগদ ৫০০ মার্কিন ডলার আয় করেন!

দক্ষিন আফ্রিকার আবশ্যিক সামরিক জীবনকে না বলে মাস্ক কানাডা পাড়ি দেন উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে। যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অফ পেনসিলভেনিয়া থেকে তিনি অর্থনীতিতে স্নাতক সম্পন্ন করেন। পরবর্তীতে তিনি পদার্থবিজ্ঞানের উপর দ্বিতীয় স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। এনার্জি ফিজিক্সের উপর পিএইচডি করার উদ্দেশ্যে মাস্ক স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার পরপরই ঠিক করেন ব্যবসায়িক উদ্যোক্তা হওয়ার দিকে মনোনিবেশ করবেন এবং ঠিক ২দিন পর তিনি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ড্রপ আউট হন।

শুরুর দিকে ইন্টারনেটের অপার সম্ভাবনাই মূলত ইলন মাস্ককে জিপ টু তৈরিতে অনুপ্রেরণা দেয়, এমন একটি সফটওয়্যার যা শহরের খবরের কাগজের জন্য ইন্টারনেট গাইড হিসেবে ব্যবহৃত হতো। জিপ টু এর সিইও পদের জন্য মাস্ক আগ্রহী হলে তাঁর নিজের কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদই তাঁকে বাঁধা দেয়। ইতিমধ্যে বিখ্যাত টেক কোম্পানি কমপ্যাক জিপ টু কে অধিগ্রহণ করলে মাস্ক পকেটে পুরে নেন ২২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। জিপ টু এর পাট চুকিয়ে মাস্ক নিয়ে আসলেন এক্স ডট কম নিয়ে। আমাদের দেশে বিকাশ-নগদের মাধ্যমে টাকা আদান-প্রদানের ধারণাটাই মাস্ক এক্স ডট কমের মাধ্যমে দিয়েছিলেন, যা পরবর্তীতে রূপ নেয় বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় অনলাইন টাকা আদান-প্রদানের মাধ্যম পেপ্যাল এ। ২০০২ সালে ই-কমার্স প্রতিষ্ঠান ইবে পেপ্যালকে ১.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে কিনে নেয় যা তখনকার সময়ে সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অধিগ্রহণ ছিল। পেপ্যালের ১১.৭ শতাংশ শেয়ার ইলন মাস্কের ব্যাংক একাউন্টে জমা করে প্রায় ১৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। এরপর মাস্ক কিন্তু চাইলেই

মিলিয়নিয়ারের তকমা দিয়ে অনায়েসেই বিলাসী এক জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু মাস্কের স্বপ্নটা ছিল আরও অনেক বড় ও সুদূরপ্রসারী।

ইলন মাস্কের ইচ্ছা ছিল, আন্তঃমহাদেশীয় রকেট দিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে মহাকাশে পণ্য সরবরাহ করবেন। রকেট কেনার উদ্দ্যেশে মাস্ক রাশিয়ায় গিয়ে দেখেন যে এক একটি আন্ত:মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের দাম প্রায় ৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং যা একবারই ব্যবহারযোগ্য। এমনকি ক্ষেপণাস্ত্র তৈরিকারকেরাও মাস্কের সাথে ঠাট্টা মশকরা শুরু করেন। হতাশাগ্রস্থ হয়ে দেশের পথে ফিরে আসার পথিমধ্যেই মাস্ক ঠিক করেন যে, তিনি নিজেই স্বল্পমূল্যে এমন সব রকেট বানাবেন যা পৃথিবীর অরবিটের ছাড়িয়ে পাড়ি দিতে সক্ষম এবং একইসাথে যা পুনর্ব্যবহারযোগ্য। রকেট পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলার স্লোগানে মাস্ক বলেন,

“আমরা এসব অত্যাধুনিক রকেট বানাই এবং প্রতি অভিযানের শেষে এগুলো ধ্বংস করে দেই। এটা সত্যিই হাস্যকর।”

২০০২ সালের ৬ই মে ইলন মাস্ক প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ ব্যক্তিমালিকানাধীন মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্স।

স্পেসএক্স দিয়ে শুরুতেই ইলন মাস্ক বাজিমাত করে দিয়েছিলেন, তা ভাবা ভুল। বরং পরপর তিনটি ব্যর্থ রকেট উৎক্ষেপণের পর অনেকে স্পেস এক্সের অন্তিম সময় দেখে ফেলেছিলেন। তবুও ইলন মাস্ক হাল ছাড়েননি। তিনি নিজের প্রযুক্তির উপর শতভাগ আস্থা রেখেছিলেন। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন তাঁর এই প্রযুক্তির উপর ভর করেই তাঁর স্বপ্ন পাড়ি দিবে মহাকাশে। শত বাধা ও ঝুঁকিকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে স্পেসএক্স ফ্যালকন-১ রকেটের সফল উৎক্ষেপণ হলো। রবার্ট ব্রুসের বারবার চেষ্টার সেই গল্পটার সাথে আমরা ইলন মাস্ক-স্পেসএক্স এর যোগসূত্র খুঁজে বের করতেই পারি।

ইলন মাস্ক ছিলেন এমন একজন মানুষ, যার মস্তিষ্ক সবসময়ই ব্যস্ত থাকতো সুদূরপ্রসারী কোনো চিন্তাভাবনায়। তিনি মনে করতেন, মানবজাতির পদচারণা শুধুমাত্র পৃথিবী থাকাটা হাস্যকর, কেননা পৃথিবীর বুকে যে কোনো মহাবিপর্যয়ে নিমিষেই মানবজাতির বিলুপ্তি ঘটতে পারে। তাই ইলন মাস্ক নিকট ভবিষ্যতেই মঙ্গল গ্রহে মানব বসতি স্থাপনের উদ্যোগ নিলেন। মাস্ক মনে করতেন, পৃথিবী থেকে ৫৪.৬ মিলিয়ন কিলোমিটার পথ পাড়ি দেয়ার খরচ যোগানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হলো রকেট পুনর্ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। স্পেসএক্স তৈরি করলো ফ্যালকন-৯, ফ্যালকন হেভি, মহাকাশে পাঠালো নাসার নভোচারীদের। ২০২০-২০২৪ সালের মধ্যে মাস্কের সেই “মিশন টু মার্স” এখন অনেকটাই বাস্তব। মাস্ক মঙ্গল নিয়ে এতটাই আশাবাদী যে তিনি পৃথিবীতে নয়, বরং মঙ্গল গ্রহে মৃত্যুবরণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন!

স্পেসএক্স প্রতিষ্ঠার ২ বছর পর ইলন মাস্ক ঠিক করলেন, পৃথিবীর জ্বালানির ঘাটতি কমানোর জন্য বৈদ্যুতিক শক্তিচালিত গাড়ির কোনো বিকল্প নেই। তাই তিনি প্রতিষ্ঠা করলেন টেসলা ইনকর্পোরেটেড, বৈদ্যুতিক জ্বালানি শক্তিচালিত মোটরগাড়ির সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। ইলন মাস্ক নিশ্চিত করেন যে, টেসলার ফ্যাক্টরি থেকে বের হওয়া প্রতিটি গাড়ি যেন ১০০% পরিবেশবান্ধব ও জ্বালানি সাশ্রয়ী হয়। আবার যদি বলা হয়, ঢাকা থেকে দেশের যেকোনো প্রান্তে যাতায়াত সম্ভব মাত্র কয়েক মিনিটে, অবাক হওয়াটাই স্বাভাবিক। ইলন মাস্ক এমন একটি যোগাযোগ ব্যবস্থার কথা বলেছেন, যেখানে এসব কিছু সম্ভব। তিনি এর নাম দিয়েছেন হাইপারলুপ। মাটির নিচ দিয়ে লুপের মধ্য দিয়ে চলমান এক ক্যাপস্যুলের সাহায্যে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের দূরত্ব চলে আসবে মাত্র কয়েক ঘণ্টায়।

ইলন মাস্কের নানান উদ্যোগের মধ্যে আরো রয়েছে সোলার সিটি, ওপেন এআই, নিউরালিংক, গিগাফ্যাক্টরি, স্টারলিংকের মত আরো অনেক উদ্ভাবনী ধারণা। কয়েকদিন আগে থাইল্যান্ডের এক গুহায় শিশুদের আটকে পড়ার সময়ে ইলন মাস্ক ফ্যালকন ৯ রকেটের তরল অক্সিজেন সরবরাহ করার টিউব দিয়ে তৈরিকৃত একটি মিনি সাবমেরিন দান করে উদ্ধার কর্মীদের সাহায্য করেন।

সফল কোনো ব্যক্তি জীবনে সমালোচনার শিকার হননি, এরকম উদাহরণ পাওয়া আসলেই দুষ্কর। যেমনটি ঘটেছে ইলন মাস্কের ক্ষেত্রেও। স্কুল জীবনের শুরু থেকেই তিনি অন্যান্য শিক্ষার্থীদের চোখে যেমন তুচ্ছ ছিলেন, তেমনি সমালোচিত হয়েছেন নিজের বিভিন্ন চিন্তাধারার জন্যও। এমনকি মঙ্গল গ্রহ নিয়ে মাস্কের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনাকেও অনেকে অহেতুক বলেছেন। কিন্তু খোদ ইলন মাস্ক বলেন,

"তোমার কাজের প্রতি একজন যুক্তিসম্পন্ন সমালোচক স্বর্ণালংকারের মত মূল্যবান।"

পরিশেষে বলা যায়, এত দ্রুতই ইলন মাস্ক পৃথিবীতে যে আমূল পরিবর্তনের ছাপ রেখে যাচ্ছেন, তা সত্যিই সাধারণ সাফল্যের পাল্লায় পরিমাপ করা সম্ভব নয়। বলাই বাহুল্য, "ভবিষ্যতের পৃথিবীর অন্যতম রূপকার কে"- এমন প্রশ্নের উত্তরে প্রথমেই যে নামটি এই মূহুর্তেই সবার মাথায় আসবে, তিনিই হলেন ইলন মাস্ক।

তথ্য সংগ্রহ: বিবিসি, ফোর্বস, অ্যাস্ট্রাম পিপল, উইকিপিডিয়া

পরিচয়

জেবা মুবাশ্বিরা
আইন বিভাগ, ব্যাচ-২০২০

আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। এবার কিছু হিসেব মেলানো বাকি সঙ্গে খুঁজতে হবে কিছু উত্তর। মৃত্যুভয়কে জয় করতে পারলে পৃথিবীতে অনেক কাজই সহজ হয়ে যায়। তাই ভবঘুরের মতো রাস্তায় রাস্তায় আজ পুরো তিন দিন পার হয়ে গেলো নন্দিনীর। কি সহজেই সাজানো জীবনটা বদলে গেলো না সেদিন...। ভাবতে ভাবতে এক বৃদ্ধার সাথে ধাক্কা খেলো সে। বিকেল ফুরিয়ে কখন সন্ধ্যে হয়ে গেছে খেয়ালই করেনি নন্দিনী। এমনিতেও পাহাড়ি এলাকায় প্রচণ্ড শীতে এমন নির্জন গলিতে আলোর সন্ধান বৃথা। বৃদ্ধা নন্দিনীকে দেখে খানিকটা চমকে উঠলেন। এত সুন্দর মুখশ্রী অথচ গায়ে এমন মলিন কাপড়। চোখ দুটো বিষণ্ন আর পায়ের অবস্থা তো বলাই বাহুল্য। বৃদ্ধা তার কাঁধে হাত রেখে বললো, "কী হয়েছে মা? তুমি এমন হয়ে আছো কেনো?" নন্দিনী অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলো, "আপনি বাঙালি?"

"হ্যা..বয়স সত্তর পেরিয়েছে। এই চোখে চশমা থাকলেও আপন মানুষ চিনতে কখনো ভুল হয় না গো! তাছাড়া পায়ে অমন সুন্দর আলতা একমাত্র বাঙালি তরুণীই দেয়!"

নন্দিনী আর নিজেকে আটকে রাখতে পারলো না। বৃদ্ধাকে জড়িয়ে ধরে অঝোর ধারায় কান্না শুরু করলো। বৃদ্ধা বললো, মা চলো আমার সাথে। এই পরের গলিতেই আমার বাড়ি। না করতে পারলো না সে।

বাড়ির ছাদে বৃদ্ধা দুটো কাউচ পেতে দিলেন। এতদিন পর গরম পানিতে গোসল করার পর ক্লান্তি অনেকটাই নেই। আত্মহত্যার ইচ্ছেটাও এখন ম্লান। পরিষ্কার পোষাক মনকে প্রসণ্নতা দেয় কথাটা খুবই সত্য। নন্দিনী এখানে আসার পরে সেই এতটুকু সময় হয়নি যে কোথাও বসে দুটো স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বরফে ঢাকা পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে বলবে, "কাশ্মীর এত সুন্দর!" আজ তিনটে দীর্ঘ দিন পর বলার সুযোগ হলো অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস সময়টা এখন রাত। সে জানেনা কাল সূর্যের আলো তার দেখা হবে কি না। অনুভব করা হবে কি না কাশ্মীরের মোলায়েম শীতলতা কিংবা বরফের গায়ে সূর্যের পড়ন্ত রোদের ছটা। তবে কিছু কথা সে যদি না জানিয়ে যায়, তাহলে হয়তো তার জীবনের মতো মৃত্যুটাও হবে অর্থহীন।

বৃদ্ধা বললেন, মা, আমি প্রায় এগারো বছর যাবত শ্রীনগরে আছি। এই দীর্ঘ সময়ে আমি বাঙালির দেখা পেয়েছি অনেকবার। কিন্তু কখনো ভাবিনি আমার আপন সে জায়গার কাউকে এমন অবস্থায় দেখবো। তোমার কি হয়েছে মা? বলো আমাকে..।

নন্দিনী কিছুক্ষণ চুপ করে শুন্য দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো সামনে। এরপর ধীরে ধীরে বললো,

"আমি নন্দিনী..। হাল আমলের সচেতন শিক্ষিতা একজন বাঙালি মেয়ে আমি কিংবা..ছিলেম বললেও ভুল হবে না। অনবরত আত্মগোপনে নিজের পরিচয়ই ভুলতে বসেছি। আজ আপনি না থাকলে আমার শেষ ঠিকানা হতো কোনো পাহাড়ের কিনারা যার ওপারে আমার দেহের অবশিষ্টাংশও হয়তো পেত না কেউ। এক পাহাড় সমান যন্ত্রণা নিয়ে হয়তো আমার মৃত শরীর পড়ে থাকতো। কোনো এক নিস্তব্ধ খাদে। মা জানেন, আসলে আমরা না আমাদের ভাগ্য নিজেরাই লিখি কিন্তু আমাদের অন্ধ চোখে কখনো সেই অদৃশ্য কলমটা দেখতে পাই না।

দু'বছর আগের কথা। মেজর অভিষেকের সাথে আমার প্রথম পরিচয় হয় কোলকাতায়। কলেজ স্ট্রিটের এক বইয়ের দোকানে। এলিফ শাফাকের "ফোরটি রুলস অফ লাভ" বইটা নিয়ে দরদাম করছিলাম এমন সময় পেছন থেকে সে বলে উঠলো, "আমরা মানুষ কতোটা সফিস্টিকেটেড হয়ে গেছি ভাবা যায়! বাজারে এখন শিল্পের মূল্যও দরদাম করি!" "তার কথার অর্থ আমি তখন বুঝিনি। আজও বুঝি না। কিন্তু এই মানুষটার কথায় একটা কেমন যেন আকর্ষণ ছিলো। এড়াতে পারিনি। কাকতালীয়ভাবে দেখা হয়ে গেলো আরেকদিন আরেক দোকানে। দুজনে বসলাম একটা কফি শপে। আলাপ করলাম অনেকক্ষণ কিন্তু পরিচয় পর্ব হলো সবার শেষে।" "মেজর অভিষেক ব্যানার্জি...."

"ড. নন্দিনী ঘোষ...আপনাকে দেখে আমার কেনো যেন মনেই হয়নি আপনি আর্মিতে!"

মুচকি হেসে সে বললো,

"ছুটি পাই ই ক'দিনের জন্য। তখনও যদি মনে হয় আমি আর্মিতে..তাহলে ছুটির কি প্রয়োজন!"

এভাবেই আলাপ হয় আমাদের। আলাপ থেকে ভালো লাগা আর তারপর...ভালোবাসা। এ বছর পৌষের শুরুতে আমাদের বিয়ে হবার কথা। দশ জুলাই ছিলো তার জন্মদিন। এসেছিলাম কাশ্মীরে তাকে সারপ্রাইজ দিব বলে। কিন্তু ভাবতেও পারিনি আমার জন্য কী অপেক্ষা করছিলো!

রাত তখন বারোটা বাজতে ১৫-২০ মিনিট বাকি। আমি এসে পৌঁছালাম তার বাসার সামনে। ও শহর থেকে দূরে একটা ছোট বাসা নিয়ে থাকতো। ঠিকানা জানা ছিলো। আর্মিতে থাকলেও একটু মন ভোলা মানুষ ছিলো অভিষেক। আমি ওর বাড়ির কাছে এসে কিছুটা অবাক হলাম। পুরো বাসা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোথাও আলোর আভাস পর্যন্ত নেই। দরজার কাছে আসতেই অন্ধকারের মাঝে ঘরের ভেতর কয়েকটি অবয়ব দেখি। ভয় পেয়ে যাই। বুঝতে পারছিলাম না কী করবো...। পুলিশকে কল দেওয়ার জন্য ফোনটা বের করতেই পিস্তলের ঠাণ্ডা মাজল স্পর্শ করলো আমার মাথার পেছনে। উর্দুতে কেও বললো, "কে তুই?" বলেই হাত থেকে ফোনটা নিয়ে আছড়ে ফেললো শক্ত মাটিতে। আমি হিন্দিতে কাঁপা কণ্ঠে উত্তর দিলাম, "নন্দিনী"। লোকটা কিছু না বলে বন্দুকের খোঁচায় বুঝিয়ে দিলো বাড়ির ভেতর ঢুকতে। এতক্ষণে অন্ধকার সয়ে এসেছে। ঢুকেই চিৎকার দিয়ে উঠলাম কিন্তু এর মাঝেই পেছনে থাকা সে আমার মুখ চেপে ধরলো। অসহায়ত্বের দু'ফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়লো শুধু। কিছুটা দূরে প্রচণ্ড অবহেলায় পড়ে আছে একটা লাশ..একটু দূরে দাড়িয়ে থাকা একজন আগুন্তক লাইটার জ্বালালে সে আগুনের ম্লান আলোয় বাকি সব আঁধার মনে হলেও একটা জিনিস ছিলো স্পষ্ট। মৃত মানুষটার বা হাতের আঙ্গুলে পান্নার একটা আংটি যেটা আমি তাকে উপহার দিয়েছিলাম এই গ্রীষ্মে। "অভিষেক..."।

পেছন থেকে একজন শক্ত করে আমার চুলের মুঠি ধরে বললো,

"এখানে কি করছিস...স্পাই? মিলিটারি? আইএসআই? জায়-ঈশ? লস্কর?"

উত্তর দেওয়ার মানসিকতায় ছিলাম নাহ আমি। যেন কথা বলা ভুলে গিয়েছি অনেক আগেই। আমি ক্ষণিকের জন্য কোনো অনুভূতি খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমার আশেপাশের চারজন মানুষ, এই আঁধার, মাথায় বন্দুক কিচ্ছু না। শুধু দেখছিলাম, আমার সামনে প্রাণহীন পড়ে আছে সেই মানুষটা যাকে আমি ভালোবেসেছিলাম। কষ্ট, রাগ, আতংকের এক মিথস্ক্রিয়া হচ্ছিলো মনে, যার প্রকাশ ছিলো অশ্রু যা হয়তো সেই অন্ধকারের ম্লান আলোয় কারো চোখে পড়েনি।

আমাকে টানতে টানতে ওরা নিয়ে গেলো বাড়ির পেছনে। সেখানে একটা জিপ দাঁড় করানো। আমাকে টেনে হিঁচড়ে তারা তুললো জিপে। আমার সামনে তখনও ভাসছে অভিষেকের লাশ। নির্মমভাবে উপুড় হয়ে পরে আছে...পিঠ ছুরির আঘাতে ক্ষতবিক্ষত আর মেঝে সেই রক্তে রাঙা। গাড়ি শহরের পাশে দিয়ে যেতেই আলোতে কিছুটা সম্বিত ফিরে পেলাম। কিন্তু মুখ দেখতে পারলাম না কারো। সবার মুখ ঢাকা কালো কাপড়ে। কিন্তু আলোয় জিপটা দেখে আর পরিচয়ের প্রয়োজন পরলো না। "ইন্ডিয়ান আর্মি"।

তারা একটা ভুলই করেছিলো আমাকে গাড়ির কিণারায় বসিয়ে। কেও কিছু বুঝে ওঠার আগেই আমি লাফ দিলাম। কিছুটা ঢাল পথ পেরিয়ে গড়িয়ে পড়লাম নিচের দিকে। গাড়ি কিছুটা দূরে ব্রেক করলো আর আমি প্রাণপণে ছুটলাম। পেছন থেকে সেই ভারি কণ্ঠে একটা আওয়াজই এলো, "পালাতে পারবি না তুই..শ্রীনগর আমাদের। রাতে পারবি কিন্তু দিনের আলোয় অসম্ভব!" পেছন থেকে পর পর তিনটা গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম। একটা বুলেট যেন সাই করে ঠিক কানের কাছটায় পাশ কাটিয়ে গেলো। কিছুটা দূরে পাহাড়ি জঙ্গলের মতো জায়গা পেয়ে সেদিকেই ছুটলাম....। আজ তিন দিন হলো ছুটেই চলেছি। শহরের পথে আসিনি। লুকিয়ে বেড়াচ্ছি। কারণ আমি জানি ওরা কারা আর ওদের ক্ষমতা কত। কিন্তু আজ খানিকটা পথ ভুলেই এই গলিতে আসা আর আপনার সাথে পরিচয়...। আমি জানি দিনের আলো ফুটলেই তারা কোনো না কোনোভাবে খবর পেয়েই যাবে। ফেরা আর আমার হবে নাহ। কিন্তু এই কথাগুলো বুকে রেখে বেঁচে থাকার চেয়ে কাউকে বলে মরে যাওয়া ভালো মা..। আমি জানি না অভিষেকের কি হয়েছে। জানি না ইন্ডিয়ান আর্মি কেনো তাকে খুন করলো। হয়তো কখনো জানাও হবে না। আমার এখনই চলে যেতে হবে। ওরা আপনার এখানে আমাকে খুঁজে পেলে বাঁচবেন না আপনিও। আমি দুটো মৃত্যুর চাপ সামলাতে পারবো না। যদি আমি চলে যাই আর কখনো না ফিরি। একটা নম্বর দিচ্ছি, আমার মা'র। সেই নম্বরে কল করে বলে দিবেন, নন্দিনী হার মানে নি..আর সে আপনাদের অনেক বেশি ভালোবাসতো।"

বৃদ্ধা কি বলবে ভেবে পাচ্ছিলো নাহ। কিছু করার নেই তাদের। তবে তার বড় নাতি আর্মিতে। হয়তো তাকে বললে কিছু করা যেতে পারে। বৃদ্ধা নন্দিনীকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কাছে কি তার কোনো ছবি আছে?"

নন্দিনী বললো, ".. তার একটা ছোট্টো ছবি আমি সব সময় আমার বুক পকেটে রেখে দেই যেন দূরে থাকলেও সে আমার হৃদয়ের কাছাকাছি থাকে। আমি শার্ট থেকে নিয়ে আসছি"।

নন্দিনী উঠে গিয়ে ছাদের এক পাশে ফেলে রাখা তার শার্ট থেকে অভিষেকের ছবি বের করে বৃদ্ধার হাতে দিলো।

ছবি হাতে নিয়ে বৃদ্ধার হাত কাপতে থাকলো। নন্দিনী বললো, "মা কি হয়েছে আপনার..? দাঁড়ান পানি আনছি।"

বৃদ্ধা নন্দিনীর হাত শক্ত করে ধরে ভয়ার্ত চোখে বললো,

"মা...ও মেজর অভিষেক নয়। কাশ্মীরের সবচেয়ে কুক্ষাত সন্ত্রাসী.. জায়-ঈশে-মোহাম্মাদের নেতা আমীর জুনায়েদ সিদ্দিকীর ছেলে জুলফিকার সিদ্দিকি..."।

কালো রাত

ইসমাত জাহান টুম্পা
আইন বিভাগ, ব্যাচ-২০২০

মোমেনার রক্তাক্ত লাশের পাশে দীর্ঘ দু'ঘন্টা যাবত নির্লিপ্ত বসে আছে ইউসুফ। চেহারায় কোনো উদ্বেগ নেই। চোখ অশ্রুশূন্য কিন্তু বিষণ্নতার ছাপ স্পষ্ট। তার শরীর হালকা দুলছে বাতাসের মৃদু মন্দনে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে। অঝরে পড়া বৃষ্টির বড় বড় ফোটা তার শার্ট চুইয়ে মোমেনার রক্ত গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে পার্শ্ববর্তী এক নর্দমায়। ডাস্টবিনের মাছির দল উদগ্রীব হয়ে আছে বৃষ্টি থামার অপেক্ষায়। বসবে লাশের দেহে....।

দশ ঘণ্টা পূর্বে....

রাইসাবাজার থেকে ধোলাইখাল যাওয়ার জীর্ণ পথটায় আরো কমপক্ষে বিশ বছর আগে থেকে নানান যন্ত্রাংশের দোকান নিয়ে বসেছে বিক্রেতার দল। পাক বাহিনী এই পথে ঢোকার সাহস পায় না। পুরান ঢাকার অভ্যন্তরে এই সরু গলি নিজের মাঝেই আলাদা এক জগত। যে জগতের পথ চেনে শুধু এখানকার বাসিন্দারা। গলির মাথায় ইউসুফদের সফেদ রঙা দোতালা বাড়ি। সাত সকালে লুঙ্গি পরে খালি গায়ে ছাদে এসে নিমের ডালে দাত মাজা তার প্রতিদিনকার অভ্যাস। গোবেচারা স্বভাবের আলসে বেকার যুবক ইউসুফ। বাবা নিজামুদ্দিনের তিনটে দোকান এখানে। খানদানি বড়লোক না হলেও যা পয়সাকড়ি আছে তাতে তিন পুরুষের আরামে খেয়ে পরে পেরিয়ে যাবে। তাই কখনো গায়ের ঘাম ছুটিয়ে পয়সা কামানোর তাগদা অনুভব করেনি ইউসুফ।

ছেলের এই উদ্দেশ্যহীন মনোভাব ভালো লাগে না নিজামুদ্দিনের। বাড়ির উল্টো পাশের চায়ের দোকানি মিন্টু তাকে পরামর্শ দিয়েছে অতিসত্বর ছেলের বিয়ে না দিলে বখে যাবে। এই নিয়ে স্ত্রী জয়নবের সাথে অনেকদিন আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয়েছে আজ পাত্রী দেখা হবে। দেশের অবস্থা খারাপ। চারদিকে যুদ্ধের আবহ। কিন্তু সেই আবহের তেমন ছোয়া লাগেনি পুরান ঢাকায়। কেন যে বাঙালির আলাদা দেশ লাগবে ভেবে পায় না নিজামুদ্দিন। জিন্নাহ সাহেবের একনিষ্ঠ ভক্ত সে। তার পূর্ব পুরুষগণ ছিলেন করাচিতে। মাঝেমধ্যেই বাল্যকালের কথা মনে করে পাকিস্তানে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় তার। কিন্তু এখানে আখের গুছিয়ে নেওয়ায় আর পারেন না।

লুঙ্গির কোণা হাতে নিয়ে ছাদে উঠে ইউসুফকে ডাকলেন নিজামুদ্দিন, "জমিদার সাহেবের দাত মাজা হলি একটু নিচে আইচেন। চেগায় দিয়া সারাদিন বইয়া থাকা ছাড়া তো কুনো কাম নাই আপনের।"

বাবার কথায় পেছনে ফিরে মুখভর্তি ফেনা ফেলে ইউসুফ।

"আব্বা বিয়া করুম না এহনি।"

"তুই করবি তর বাপে হুদ্দা করবো।"

"আপনে করলে করেনগা। আমি করুম না।"

"চুপ থাক হারামজাদা। নিচে আইয়া শিগগির তৈয়ার হ। পাত্রীর বাড়ি যামু।"

নিরাশ মনে নিচে নেমে জামা পরে ইউসুফ। বাবার কথা না শুনলে বিপদ। যদি জমিতে অংশী না দেয় তবে না খেয়ে মরতে হবে। তাছাড়াও বিয়ে বোধয় এতো খারাপও না। সদ্য বিবাহিত বন্ধু সুজনের কাছে বাসর রাতের গল্প শুনে তার যে বিয়ে করার ইচ্ছে একেবারেই হয়নি তা না!

পাত্রীর বাড়ি রিকশায়ই যাওয়া যায়। কিন্তু একটু বংশীয় দম্ভ দেখাতে সদ্য কেনা মোটরগাড়ি বের করলেন নিজামুদ্দিন। রওনা দিলেন সদরঘাটের উদ্দেশ্যে।

বাড়ির ফটকে তাদের অভ্যর্থনা জানাতেই দাঁড়িয়েছিলেন খয়ের মুনশী। পাত্রীর বাবা। গাড়ি আসতেই সম্মান দিয়ে দরজা খুলে দিলেন তিনি। পাত্রের পরিবারের যত্নআত্তি না করলে বিপদ। মেয়ে সুখী হবে না। সবাইকে নিয়ে বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করলেন তারা। ঘোমটা সরিয়ে সালাম দিলেন মুনশির স্ত্রী বিলকিস।

প্রথমে দ্বিমত করলেও এখন মন আনচান করছে ইউসুফের। কলেজে থাকতে দূর থেকে মেয়েদের দেখলেই তার কেমন যেন লাগতো। ইচ্ছে হতো কথা বলতে, প্রেম করতে। কিন্তু কথা বলা তো দূর কাছাকাছি যাওয়ারও কখনো সাহস হয়নি তার। লোকে দেখে ফেললে তার বাবার কানে পৌঁছানো সামান্য সময়ের ব্যাপার মাত্র। আর আজ সে সবার অনুমতিতেই স্বেচ্ছায় মেয়ে দেখলো। বাড়ির আঙিনায় পাতা সোফায় বসতেই চা নিয়ে আসলো একটা মেয়ে। পরনে সালোয়ার কামিজ। দুধে আলতা গায়ের রং, মুখ ঢাকা ঘোমটায়। তবে যেটুকু খোলা তাতেই মন ভরে গেলো ইউসুফের। ঘোমটাকে মনে হচ্ছে অসংজ্ঞায়িত মেঘমালা, যা নিঃশব্দ প্রহরীর মতো পাহারা দিচ্ছে নির্লিপ্ত শশাংকের অদৃশ্য প্রাঙ্গণ।

নিজামুদ্দিন জিজ্ঞেস করলেন, "মা তোমার নাম কি?"

"মোমেনা"

"পড়াশোনা করছো?"

"জ্বি বিএ পাশ করলাম।"

"আলহামদুলিল্লাহ।"

নিজামুদ্দিন বেশ খুশিই হলেন। নিজে তেমন পড়েননি আর ছেলে তো নেহায়েতই গোবর বুদ্ধি। বাড়িতে একটা পড়াশোনা জানা ছেলের বউ থাকলে মন্দ হয় না। জয়নাব বেগম জিজ্ঞেস করলেন, "রান্নাবান্না জানো?"

"জ্বি"

"সব তরকারি পারো?"

"জ্বি"

"একটু ঘোমটা সরায়ে চুল দেখাও তো! এই ইউসুফ অন্যদিকে তাকা।"

ইউসুফ অন্যদিকে তাকালেও আড়চোখে দেখতে পেলো মোমেনার ঘোমটা খুলে দীর্ঘ কেশের আলোড়ন। নাকে লাগলো সদ্য স্নানে বেরিয়ে আসা শ্যাম্পুর মনোমুগ্ধকর ঘ্রাণ। বিয়ে তাকে করতেই হবে। মোমেনা আবার ঘোমটা দিলে তার দিকে তাকালো ইউসুফ। এই সময় টেবিলে পরিবেশন করা হলো নানান রকম খাবার।

"এসবের কি দরকার ছিলো", বলে হালকা হেসে একটা সিংগারা হাতে নিলেন নিজামুদ্দিন। আলাপ চললো পরিবার পরিজন, ব্যবসাপাতি নিয়ে। কিন্তু ইউসুফের এসবে মন নেই। সে আঁড়চোখে বিনা বিরতিতে একটু পর পর দেখছে মোমেনাকে। সে মাথা নিচু করে বসে আছে। ঠোঁটে লাজুক হাসি। ঘন্টা খানেক পর বিদায় নিলো তারা। বিদায় বেলায় সুযোগ বুঝে মোমেনার কানে বললো, আজ রাতে একবার ছাদে আসতে পারবেন?

মোমেনা কোনো উত্তর দিলো না। মুখ টিপে সামান্য হাসলো। নিজামুদ্দিন খয়ের মুনশির হাত ধরে বললেন, "আলহামদুলিল্লাহ আমাদের মেয়ে পছন্দ হয়েছে অনেক। মাশাল্লাহ।"

"আলহামদুলিল্লাহ। ছেলের কোনো দ্বিমত নেই তো?"

"আরে না ভাই কি যে বলেন ওর আবার কিসের দ্বিমত। আজ তাইলে যাই। ইনশাআল্লাহ আগামীকাল বিকালে বাকি আলাপ সারতে আপনার সাথে এক দফা দেখা করবো। দোকানে আইসেন।"

"জ্বি ভাই। অবশ্যই।"

সালাম জানিয়ে করমর্দন করে মোটর গাড়িতে চড়ে বসলেন সবাই। ফটকে দাড়িয়ে হাত নাড়ছেন মুনশী। মোমেনা আগেই চলে গেছে ওপরে। বারান্দায় বসে একদৃষ্টে চেয়ে আছে তাদের দিকে। গাড়ির কাচ হালকা নামিয়ে তাকে দেখলো ইউসুফ। কে জানে হয়তো আজ রাতে সত্যি ছাদে আসবে মেয়েটা!

নতুন কেনা শার্ট পরে চুল আঁচড়ে গায়ে সুগন্ধি দিলো ইউসুফ। রাত তখন দশটা। বাইরে পিনপতন নিরবতা। পাশের রুম থেকে ভেসে আসছে নিজামুদ্দিনের অস্পষ্ট নাসিকার গর্জন। ধীরপায়ে দরজা খুলে তালা দিয়ে বেরিয়ে পরলো ইউসুফ। রওনা দিলো মোমেনার বাড়ির উদ্দেশ্যে। সে মনে মনে আশা করেছিলো মোমেনা ছাদে আসবে। কিন্তু যখন তাকে বাড়ির ফটকের বাইরে একটা বক্স হাতে দাড়িয়ে থাকতে দেখলো মন জুড়িয়ে গেলো তার।

ইউসুফ জিজ্ঞেস করলো, "এটা কি?"

"আপনার জন্য আমের আচার এনেছি। আমার বানানো।"

"সত্যি!"

ইউসুফ আচারের বক্স হাতে নিলো।

"আপনি যে এত রাতে বের হবেন আমি ভাবিনি।"

"অনেক ঝামেলা করে বেরিয়েছি.."

"ধন্যবাদ আপনাকে।"

"হাটবেন?"

"এত রাতে? কেও কিছু বলবে না?"

"কেও দেখবে না। চলুন জগন্নাথের সামনে থেকে হেটে আসি। ওখানে রাতে অনেকেই হাটে। মেয়েরাও।"

"চলুন"

পাশাপাশি হাটছে ইউসুফ আর মোমেনা। ইউসুফের হৃদ স্পন্দন আকাশচুম্বী। হয়তো পাশে থাকা মেয়েটাও শুনতে পাচ্ছে তার সিক্ত হৃদয়ের আকুতি। মুচকি হাসছে মোমেনা। ইউসুফের জীবনে এমন সুন্দর মুহূর্ত এর আগে আসেনি। অন্ধকারাচ্ছন্ন শূণ্যলোকের নিচে ঢাকার রাজপথে সোডিয়াম বাতির আলোয় এক অপরিচিতার সাথে সে হাটবে এটা ছিলো তার কল্পনারও বাইরে। কিংবা হয়তো কল্পনাই।

মোমেনা বা ইউসুফ কারোই খেয়াল ছিলো না আশেপাশের পরিবেশ। হয়তো তাদের এই যাত্রার সমাপ্তি হতো এক অপার্থিব নান্দনিকতায়। সে স্বপ্নেই বিভোর ছিলো দুই তরুণ-তরুণী। কিন্তু প্রকৃতি সহায় হয়নি তাদের। কিছু বুঝে

ওঠার আগেই চারদিকে হঠাতই সরগরম হয়ে গেলো নিস্তব্ধ রাজপথ। বাতাসে মিশে গেলো সাইরেনের তীক্ষ্ম শব্দ আর মৌমাছির ঝাকের মতো ছুটে আসলো অসংখ্য বুলেট। শত বুলেটের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গেলো বাড়ির জানালা। গুলির ছিদ্রে জাল হলো বন্ধ দোকানের শাটার। রাজপথে লুটিয়ে পড়লো নিস্প্রাণ দেহ। আর সেই হাজার বুলেটের দুটো এসে লাগলো মোমেনার বুকে। হাটু ভেঙে বসে পড়লো সে...ধরার চেষ্টা করলো ইউসুফ। পারলো না। পিচ ঢালা রাস্তার শক্ত তলে গা এলিয়ে দিলো মোমেনা। ফিনকি দিয়ে বের হলো রক্ত। নির্জীব দেহের পাশে পরম অবহেলায় বাক্স খুলে ছড়িয়ে পরেছে মোমেনার বানানো আমের আচার।

তার নিথর দেহ চিরনিদ্রায় পড়ে থাকলো ইউসুফের বাহুডোরে। সে ঘোরের মাঝে আছে। কি করবে বুঝতে পারেনা ইউসুফ। এ সময় আকাশভেঙে নামলো বৃষ্টি। আর তাই হয়তো তার বেদনাসিক্ত অশ্রুও মিশে গেলো সেই আসমানি জলে। চারদিকে প্রচণ্ড গোলাগুলি, গাড়ির শব্দ, কাচ ভাঙার আওয়াজ কিংবা মানুষের আর্তনাদের মাঝেও ইউসুফের মনে হচ্ছে সবকিছু যেন চুপচাপ। নিস্তব্ধ। সে ভেবেছিলো আজ মোমেনাকে বলবে, আপনাকে আমার ভালো লাগে। আজ আমি জীবনে প্রথম এবং শেষবারের মতো কাউকে প্রেমের নিবেদন জানাবো আর সে মানুষটা হচ্ছেন আপনি। মনে রাখবেন আজকের এই তারিখ। আজ ২৫ শে মার্চ.....

অমাবশ্যার চোখে

আল জামাল মোস্তফা সিন্দাইনী (তমাল)
সহকারী অধ্যাপক, সমাজবিজ্ঞান বিভাগ

অমাবশ্যার চোখে গাঢ় অন্ধকারে
জেগে থাকা রাত্রি দেখেছি
আকাঙ্ক্ষার বাঁধন খুলতে পারিনি একা
মেঘের চোখে জল দেখেছি বহুবার
সেই জল যুবতি ফুল পেয়ে হেসে উঠেছে
ইচ্ছের নির্বাসনে সীমাহীন পথে কে যেনো ডেকেছে।
মনের ভিটে পড়ে আছে আকাশের নিচে একা
যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর ফিকে হয়ে যায়
কেউ কিছু বোঝে না সীমাহীন মোহে
সুখের বাতাস অনেক কাল ধরে জানালায় আসে
বোধেরা নির্বাক হয়ে স্বপ্নের তরী খোলে
মাতাল বাতাসে উড়ে রঙিন ঘুড়ি ।
বিদগ্ধ ভাঙ্গা আয়নায় চোখ রাখতে পারি না
চেতনার দাবিতে রিক্ত দুপুরে ঝড় ওঠে
অকাতরে বিষন্ন মন বার বার খোঁজে শান্তি
দিন দিন সুদীর্ঘ সীমানায় নতুন স্বপ্ন দেখি
রাতের সুবাসে সামনে দেখি সুদিন
দিগন্ত রেখায় আমার শব্দ রয়েছে উড্ডীন।
আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভেবেছি কতো
নিরাভরণ মনে নিরুত্তাপ চেয়েছি
মনের সিঁড়ির নিচে দুর্যোগ আর নেই
বিষন্ন সন্ধ্যার উচ্ছ্বাস হাহাকার দূরে গেছে
মনের মানুষ খুঁজে পাই অফুরন্ত হাসিতে
অমাবশ্যার চোখে সে নাকি রঙিন হয়ে ভাসে।

Losing a Mother Forever

Srabonti Habib Proma
Dept. of BBA in Marketing, Batch: 2018

Raindrops snaked down the windscreen as Jane made her way out of the car. It was raining heavily with thunder crashing every now and then. She crept into her room as silently as a mouse. Her heart was flooded with profound desolation. Gazing out of the window, she realized that nature was weeping like her, sadly shedding tears. All the blissful moments she had spent with her mother came flashing back in her mind like an old film. The unprecedented incident had left her battered like anything.

Time is the best healer. But it failed to soothe Jane's pain. With the passage of time, nature changed with seasons. Autumn arrived with backpacks full of fluffy clouds, which it set free in the azure sky to sail. Busy city life regained its prompt, bidding farewell to the rainy season. But Jane was completely unaffected by any excitement. She was not leading life but life was leading her. Numb, she looked, as a body without a soul, functioning devoid of feelings. The field overlooking Jane's stained window was shrouded with golden crops as late autumn rang the calling bell. But Jane never opened the door. The flashing, gold-like hue compelled her to peer through the peep-hole. Stealing a glance, she felt a web of memories surfacing from the deep, as she trotted among the crops, clasping her mother's hand, who used to shield her from any fear. But that hand was lost. Jane's mother had passed away in an accident.

A few days later, chilly wind blew to inform Jane about the arrival of winter. Grieved nature was concealed in a blanket of mist during the early morning. As the dim sun lazily surfaced to life, dew drops, scattered across the meadow, glistened like pieces of pearl. Brown leaves descended steadily from the contiguous oak tree as Jane's elder sister cooked delicious hotchpotch. Ignoring the fun of eating with family, Jane wanted to have her meal privately in her room. One day, a cuckoo in a near-by tree made Jane quite moved with its melodious rendition. The tune worked as a soothing balm over Jane's diseased mind. She was involuntarily made known to the fact that spring was paying a visit to her. Beautiful flowers adorned the nature with their gorgeous splendour. Spring had been Jane's favourite season but today it made no difference to her.

The bright, blazing sun was back with its might in summer. The speck of rays peeped stealthily into Jane's window, anticipating to act as a ray of hope for Jane to finally recover. The sound of the ringing bell made by the ice-cream maker had always charmed an innocent little girl. And today, almost a year after receiving a tremendous shock, this girl came running to have her feast. And, when she did realize the metamorphosis in her, she steadily accepted the fact that just like the flow of seasons, life flows too, fetching man from one phase of it to the next.

স্বপ্নের প্রজাপতি

সাজিয়া রহমান
মাস্টার্স অব ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ, ব্যাচ-২০১৯

চেতনার আড়ালে রাতের বিষাদে ক্লান্তি নেমে আসে
প্রকৃতির ভালোবাসায় বিশ্বাস কখনো হারিয়ে যেতে পারে না
গভীর ছায়ায় চাঁদের আলো ফিকে হয়ে যায়
আকাশের উদারতায় কোলাহল নেই বিষন্নতার নীল ছোয়ায়
মনের বাসনারা রঙের অভিন্যস্তে হারিয়ে যায় সীমান্তে
রাতের ডাকে বিমূর্ত সময় পার হয় একান্তে।
গোপন অনুতাপে ব্যথার কান্নায় শুধু ব্যাকুল হই
অনেক যন্ত্রণায় একান্তে ভাবি নিজের ছায়া দেখে
অচেনা পথে চলতে চলতে পাইনি কোনো ঠিকানা
জোছনা রাতে সময়ের সাথে মনের বাগিচা পাইনি
পাখিদের গানে জীবনের টানে সুখ মেলেনি হাতে
স্বপ্নের প্রজাপতি পাইনি খুঁজে প্রগাঢ় ঘুমের রাতে।
শিশিরের ছোয়া উদ্বেলিত হৃদয়ে রোদের দিন খুঁজেছি
রাতের ছায়ায় তারার আকাশের গল্প কেউ বলেনি
মেঘের শরীরে বৃষ্টি ঝরে সজীবতাকে ডাক দেয়
মনের দুয়ারে আসেনি কেউ প্রেমের কাব্য নিয়ে
বাতাসের কান্না দেখেছি শুধু জীবন পথের ধারে
জীবন নদীতে ঢেউ জাগেনা ভালোবাসার গানের সুরে।
ভাবনার আঙিনায় দাঁড়িয়ে থেকে শুধু কষ্ট পেয়েছি
বিকেলের রূপে অনেক আশায় পাইনি আমার প্রেম
স্বপ্নে কেঁদেছি নিভৃত ঘরে অনেক নদী পেরিয়ে
ভালোবাসার ব্যকুলতায় অনেক সময় চলে গেছে একাকী
অবাক বিস্ময়ে কষ্টের ঝড়ে ভেঙেছে মনের ঘর
ভালোবাসা পাইনি জীবন পথে সবাই হয়েছে পর।

অতীত

এহসানুল হক
ডিপার্টমেন্ট অব বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ইন ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ
ব্যাচ-২০২০

কোয়ারেন্টিনে বসে সিরিজ দেখা পরিণত হয়েছে আমাদের নিত্যদিনের অভ্যাসে। নেটফ্লিক্স, অ্যামাজন প্রাইম, স্পটিফাই, ভূত ইত্যাদি প্লাটফর্মে অসংখ্য অসাধারণ সিরিজ রয়েছে যেসবের দারুণ প্লট, সিনেমাটোগ্রাফি, ডায়লগের জুরি মেলা ভার। তবে এসব সিরিজের মধ্যেও একটু ভিন্ন ঘরানার সবচেয়ে আলোচিত সিরিজ হচ্ছে ডার্ক। সময়ের মায়াজালে আটকে পরা জীবনচক্রের এক দারুণ চিত্রায়িত রূপ দেখিয়েছেন নির্মাতা। পাঠক হয়তো ভাবছেন আমি ডার্ক নিয়ে কিছু লিখবো কিন্তু না। ডার্ক নিয়ে হাজারো মতবাদ, তত্ত্ব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে পুরো ইন্টারনেট জুড়ে। আমি বরং আজ লিখবো "সময়" নিয়ে।

যদি আমি বলি আমরা সবাই অতীতে বাস করি কথাটা কি বিশ্বাস করবেন? মনে হয় না। তবে দেখা যাক বিশ্বাস করাতে পারি কিনা। স্কারলেট জোহানসন অভিনীত "লুসি" মুভিটা আমরা অনেকেই দেখেছি। সেখানে আমরা কিছুটা হলেও অনুভব করেছি আমাদের মস্তিষ্কের অদ্ভুত সব খেলা। ভাবতেই অবাক লাগে যে ৩৬১ গ্রামের একটা মগজের বলে আমরা সভ্যতা এগিয়ে নিয়ে গিয়েছি কল্পনাতীতভাবে। এই মস্তিষ্কই নিয়ন্ত্রণ করে আমাদেরকে, আমাদের মনোজগতকে। অতীত বলতেই আমাদের মনে একটা ধারণা চলে আসে যে আমরা হয়তো শতবর্ষ পেছনের কোনো গল্প বলছি। কিন্তু অদ্ভুত হলেও সত্য। মাত্র এক সেকেন্ড আগে ঘটে যাওয়া ঘটনাটাও কিন্তু অতীত। অবসরে ফেসবুকের টাইমলাইন স্ক্রল করতে করতে মাঝেমধ্যেই আমাদের সামনে কিছু অদ্ভুত মিমস এসে হাজির হয়। গোলকধাঁধার মতো। হয়তোবা অগণিত সংখ্যার আড়ালে থাকা কোনো নির্দিষ্ট সংখ্যা খুঁজতে হবে। কিংবা ঘুরতে থাকা কোনো সার্কেলের বিচিত্র প্রবাহমাত্রা, বিভিন্ন হিপনোটিজম ট্রিক্স, ফ্ল্যাশ ল্যাগ ইফেক্ট ইত্যাদি। এগুলা দেখে আমাদের মনে হয় আমরা কি চোখে ভুল দেখছি? নাকি মস্তিষ্ক আমাদের ভুল দেখাচ্ছে? এর কারণ কী?

আমরা যদি কখনো কোনো ট্যুরে গিয়ে একদৃষ্টে একটা নামজানা পাখির দিকে তাকিয়ে থাকি তবে সেই পাখিটাকে আমি শুধু চোখ দিয়ে দেখছিই না, বরং মস্তিষ্কে প্রসেসিংও করছি। চোখ একটা ক্যামেরার মতো। পাখির দিকে তাকানো মাত্রই তার গায়ে পরা আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হয়ে চোখের পিউপিলের মাধ্যমে ভেতরে আসে এবং চোখের অপটিক্যাল উপাদানগুলোর মাধ্যমে পাখিতে ফোকাস করতে সাহায্য করে। চোখের সামনের দিকের অংশটি তৈরি কর্ণিয়া আইরিস এবং লেন্স দিয়ে যা পাখির অবয়বকে গ্রহণ করে চোখের রেটিনায় প্রতিফলিত করে। রেটিনা হলো একটি সংবেদনশীল ঝিল্লি যা চক্ষুগোলকের চারপাশ দিয়ে আবৃত্ত থাকে। এটি লক্ষ লক্ষ স্নায়ু দিয়ে তৈরি। যখন ওই আলো রেটিনাকে স্পর্শ করে, সাথে সাথে তা মস্তিষ্কে সংকেত প্রেরণ করে। তারপর মস্তিষ্ক সেটিকে পাখি বলে শনাক্ত করে এবং এরপর আমাদের কি করা উচিত সেটারও আদেশ দেয় মস্তিষ্ক। মস্তিষ্কের আদেশে আমাদের চোখ সেই পাখিকে দেখতে পায়। তখন সে কম্পিউটারের হার্ডড্রাইভে ফাইল সার্চিং এর মতো পুরনো স্মৃতির খোঁজ করে এবং আবিষ্কার করে যে পাখিটি যেকোনো মুহূর্তে উড়ে যেতে পারে। মস্তিষ্কের দেওয়া সে আদেশও এই ঘটনাবলি অনুযায়ী সাদৃশ্য রেখেই হবে।

এই উদাহরণটি দেওয়ার কারণ হলো এই ব্যাপারটা অনুধাবন করা যে, কোনো বস্তুকে দেখলে তার আলো চোখ থেকে ব্রেনে যায়, আর ব্রেন তা প্রসেস করে যাতে খুব সামান্য হলেও কিছুটা সময় লাগে। আর তাই আমরা বিভ্রান্তিমূলক কিছু দেখলে মাঝে মধ্যে ভুল দেখি বলে ধারণা করি।

খুবই অদ্ভুতভাবে সত্য যে এই পুরো প্রসেস সম্পন্ন করে প্রকৃতিতে আলাদা আলাদা প্রতিটা অব্জেক্ট চোখ দিয়ে দেখে সে অনুযায়ী আদেশ পুরো দেহে দিতে মস্তিষ্কের সময় লাগে মাত্র ৮০ মিলি সেকেন্ড। তবে মজার ব্যাপারটা এখানেই। যদি পুরো কথাটা বুঝতে পেরে থাকেন তবে আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন যে আপনি এখন যা দেখছেন সে ব্যাপারটা ঘটে গিয়েছে ৮০ মিলি সেকেন্ড আগেই !!

যদিও আশি মিলিসেকেন্ডে খুব একটা বেশি সময় না তবুও তা মাঝেমধ্যে ভয়ংকর হতে পারে যেমন ধরুন আপনার বন্ধু সিড়ি দিয়ে পড়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনি যখন তাকে বাঁচাতে যাবেন আপনি ইতোমধ্যেই আশি মিলিসেকেন্ডে দেরি করে ফেলেছেন। আমাদের শরীরে যে সমস্ত স্নায়ু রয়েছে, তাদের তত্ত্ব ব্রেনে পৌছে দেওয়ার গতিবেগ হলো ঘন্টায় দুশো পঞ্চাশ মাইল বা চারশ দুই কিলোমিটার। তাহলে যদি কেউ দুশো সত্তর মাইল বেগে গাড়ি চালায় সে আসলে ব্রেনের থেকে দ্রুত গতিতে চলছে। তেমনি স্নায়ুর গতিবেগ এবং মস্তিষ্কের প্রসেসিং স্পীড কিছুটা নির্ভর করে আপনি কতোটা লম্বা তার ওপরেও। যেমন যদি একজন বেটে ছেলে এবং একজন লম্বা ছেলেকে পাশাপাশি দাঁড় করিয়ে নাকে ও পায়ে আঘাত করা হয় তবে উভয়েই নাকের আঘাত আগে অনুভব করবে। কারণ চোখ, নাক এসব মস্তিষ্কের সবচেয়ে কাছের স্নায়ু। পায়ের ব্যাথাটা তারা অনুভব করবে পরে। দূরত্ব বেশি হয়ায় পায়ের তুলনায় নাকের সিগ্নাল ব্রেনে যাবে দ্রুত। মজার ব্যাপার হচ্ছে বেটে ছেলেটি লম্বা ছেলের তুলনায় আগে ব্যথা অনুভব করবে। কারণ তার পা লম্বা ছেলেটির পায়ের তুলনায় বেটে হয়ার দরুণ সিগ্নাল মস্তিষ্কে দ্রুততর পৌঁছাবে। বয়স ভেদেও এই সিগনাল ও প্রসেসিং এর ব্যাপারটা পরিবর্তিত হয় বিধায় বয়স্কদের দৈহিক ও মানসিক কার্যক্ষমতা অনেকাংশেই হ্রাস পায়।

আশি মিলিসেকেন্ডের এই দেরি মস্তিষ্ক আমাদের বুঝতে দেয় না। তাই সেটাকেই আমাদের মনে হয় বর্তমান মুহূর্ত। অর্থাৎ আপনি এই বিশ্বব্রক্ষাণ্ডে যা ই দেখছেন তা ঘটে গেছে আশি মিলিসেকেন্ড আগে। যেমন আমি যদি বলি এই মুহূর্তে আপনি এই লেখাটি পড়ছেন, তবে জেনে রাখুন তা ঘটে গেছে আশি মিলিসেকেন্ড আগে আর আপনি বাস করছেন অতীতে যেখানে বর্তমান বলে কিছু নেই।

তাহলে এবার ডার্ক সিরিজের শত টুইস্টের মাঝে আরেকটা টুইস্ট বরং ঢুকিয়ে দেওয়া যাক। যেখানে ডার্কের নির্ভুল প্লটের প্রতিটা আনাচে কানাচে লুকিয়ে আছে নতুন রহস্য সেখানে একবার ভাবুন যে তাদের আসলে বর্তমান বলতে কিছু ছিলোই না। মার্থা আর জোনাসের পরিচয়ও হয়েছিলো অতীতে, তাদের অতীতও ছিলো অতীতে এমনকি শেষ মুহূর্তে তারা যখন অতীতে ধুলো হয়ে মিশে গেলো সে ঘটনাও ঘটেছিলো আপনি দেখার আশি মিলিসেকেন্ড অতীতে!

Cadence

ANNUAL MAGAZINE

ANNUAL MAGAZINE | 2020

BANGLADESH UNIVERSITY OF PROFESSIONALS

Mirpur Cantonment, Dhaka - 1216

www.bup.edu.bd

Cadence

ANNUAL MAGAZINE 2020